জীবনের রঙ্গ

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

সরস্বতী লাইব্রেরী
সি ১৮।১৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

৺কৈলাশচন্দ্র গুহ

পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশে

নিবেদন

জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে রাজনীতির কোলাহলে। সাহিত্য আলোচনা যা কখনও হয়েছে, তা প্রায়ই জেলখানার অবসরে। বিদেশী প্রভুদের কৃপায় সেই অবসর পেয়েছি প্রায় জীবনের অর্ধেক সময়।

এই পুস্তকের গল্পগুলি সবই জেলখানায় লিখিত। দীক্ষা, পাগলী ও ব্যথার বাঁশী গল্প তিনটি পুণার যেবোড়া জেলে ১৯৩৫-৩৭ সালে লিখিত; বাকিগুলি সবই বক্সা বন্দী নিবাসে ১৯৪২-৪৫ সালের মধ্যে লিখিত।

হয়ত অনেকে আপত্তি তুলবেন—এই প্রচেষ্টা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা। এই অভিযোগের উত্তরে আমার বক্তব্য হল এই—মানুষের জীবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত নয়। জীবনের কোন এক ক্ষেত্রের গভীর অনুভূতি থেকে অপর ক্ষেত্রের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ ঠেকেও শেখে, দেখেও শেখে।

তারপর, রাজনীতি এমন একেবারে মানব-সম্পর্ক বহির্ভূত ব্যাপার নয়। মানব-জীবন সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা এর ভিতর দিয়েও হতে পারে।

তবুও এই গল্পগুলি প্রকাশ করলাম নেহাত ভয়ে ভয়েই। এর সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয়ের ভার পাঠকদের উপর। তাই তাঁদের দরবারে এদের পেশ করলাম।

গ্রন্থকার

সূচী

জীবনের বসন্ত

কুমার জিজ্ঞাসা করল—"হঠাৎ এই অশিষ্ট লোকটিকে ডেকে নিমন্ত্রণ খাওয়াবাব সখ হ'ল কেন ?"

শান-বাঁধানো মেঝেতে একখানা সুন্দব হাতে-বোনা আসন পেতে রমা খাবার জায়গা করছিল। পাশেই একখানা চেয়াবে কুমার ব'সে দেখছে। রমার শ্যাম ও তন্বী দেহে সেবাব ও নিষ্ঠাব একটা ছন্দ খেলে যাচ্ছে। তার অঙ্গ-চালনার প্রত্যেকটি গতি যেন কুমারের নিকট ছন্দেব কম্পন মনে হচ্ছিল। সে দেখছিল—বমা হাতে অল্প জল নিয়ে আস্তে আস্তে শানের উপর তা ছিটিয়ে দিল; তাব সুঠাম বাহুবল্লী পবিচ্ছদের আববণ থেকে বেব হয়ে ফণিনীর মতো ফণা মেলে মেঝেব উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে বমার মুখেব দিকে তাকিয়ে ছিল; রমা হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে দু'জনের চোখে চোখে দৃষ্টিবিনিময় হ'ল। তখনই কুমার মৃদু হেসে ঐ প্রশ্ন করল।

রমা বলল, "আচ্ছা লোক ত! গায়ে প'ড়ে গাল নিতে ভাল লাগে—অশিষ্ট আপনাকে কে বলল ?"

কুমার—"গায়ে প'ড়ে গালও অনেক সময় নিতে হয়—কিন্তু এটা ত গায়ে প'ড়ে গাল নেওয়া নয়—এটা মহাজনেব কথিত উক্তি।"

রমা—“কোন্ মহাজন না অভাগাজন আপনাকে এ কথা বলেছিল ?”

কুমার একটু হেসে বলল—“মনে পড়ছে না, মিস্ বায় ?”

রমা—“বাপরে, কী সাজ্ঘাতিক লোক আপনি! সেই কোন্ জন্মের কথা মনে ক'রে রেখেছেন!·· ···এখন আপাতত ঝগড়া রাখুন ত— আমি খাবার নিয়ে আসছি।”—ব'লেই রমা বেরিয়ে গেল। কুমার মুগ্ধচোখে আবার তার চলার ভঙ্গীব দিকে চেয়ে রইল।

রমা খাবার থালা হাতে ক'রে এসে দেখে কুমাব তখনও সেই ভাবেই ব'সে আছে। সে বলল,—“বা, বেশ লোক ত! আপনার হাত-মুখ ধোবার জল দিয়েছি কখন্। এখনও হাত-মুখ ধুলেন না ; কি ভাবছিলেন এতক্ষণ ?”

কুমার একটু হেসে বলল—“ভাবছিলাম কি জানেন ? ‘পথি নয়নোঃ স্থিত্বা স্থিত্বা তিরোভবতি ক্ষণাৎ—”

রমা রাগের ভাব দেখিয়ে বলল—“আপনার সংস্কৃত এখন রাখুন—ও সব আমি জানি না।”

কুমার বলল—“জানবাব দরকার পড়লে সবাইকেই জানতে হয়। এসেছি আধ ঘণ্টা—এর মধ্যে ৫।৭ বার এলেন আর গেলেন—একটু দেখা দিয়েই হঠাৎ লুকিয়ে যান—তাই ভাবছিলাম। প্রতিবারই ফিরে এসে একটা ক'রে হুকুম করেন—এখন ভাবছি আমার ভাগ্যে যে বিশেষণ জুটেছিল সেটা ফিরিয়ে দেব কি না।”

রমা ধপ ক'রে ভাতের থালা মাটিতে রেখে বাগের সঙ্গে বলল—“ফের আপনি ও কথা তুলবেন ত······”

কুমার হেসে বলল—"ত্বং মে প্রসাদমুখী ভব দেবী··· হে দেবী, আমার প্রতি প্রসাদমুখী হও। আর ও কথা তুলছি না। এই হাত-মুখ ধুতে যাচ্ছি।" রমা আরও খাবার বাটী প্রভৃতি আনতে বেরিয়ে গেল।

কুমার উঠে গেল—বারান্দায় গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসতেই দেখল ছ'খানা থালায় ৮।১০টা বাটি সাজিয়ে রমা প্রবেশ করছে। সে খেতে বসল। খেতে খেতে কুমার বলল—"কিন্তু ধমকিয়ে আমার আসল প্রশ্ন চাপা দিতে পারবেন না। হঠাৎ আমাকে ডেকে খাওয়াবার সখ হ'ল কেন?"

রমা বলল—"আপনি হলেন স্কুল কর্তৃপক্ষের মান্য অতিথি;—কাজেই খাতির করতে হয় বৈ কি! মাষ্টারী ক'রে ত খেতে হবে—আপনার সুপারিশে হয়ত কিছু ফায়দা মিলে যেতেও পারে।"

কুমার—"উঃ খুব হিসেবী ত! কিন্তু তাতে ত কর্তৃপক্ষের সবাইকে বাদ দিয়ে আমাকে ডাকা bad tactics হ'ল—ভুল চাল হ'ল।"

রমা—"আজকালকার দিনে অত direct approach কাজেরও হয় না, শোভনও নয়।"

কুমার—"Direct approach যে সুফলপ্রসূ হয় না, তা'ত আর বুঝতে বাকি নেই। তাই আগের দিনে ঘটক আর এখনকার দিনে Marriage Bureau বা বিবাহবিধায়ক সভা দিয়ে কাজ ····"

রমা কুমারের দিকে ভ্রূকুটি ক'রে তাকাল। কুমার একটু

হেসে বলল —"কিন্তু জানেন ত' আমাকে একলা নিমন্ত্রণ করাতে কর্ত্তৃপক্ষের মনে সন্দেহ আসতে পারে।"

রমা—"আসুক, ব'য়ে যাবে আমার তাতে।"

কুমার—"কিন্তু অসূয়া বা হিংসা ব'লে একটা রিপু আছে জানেন ত? তাদের মনে যদি সেই রিপুর উদ্রেক হয়……"

রমা—"না, আমি এখান থেকে পালাব।"

কুমার—"বেশ ত! নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনে বলছেন পালাবেন—জানেন ত'—সুন্দরি ন শোভতে প্রণয়িজনে নিরপেক্ষতা; অতএব—প্রসীদতু ভবতী।"

রমা—"খুব যে সংস্কৃত বুলি শিখেছেন।"

কুমার—"কি আর করব বলুন—এখন যে আমার apprentice period--unpaid—waiting listএ আছি—শিক্ষানবিশী চলছে--বিনা বেতনে, অপেক্ষায় আছি—কবে ডাক পড়বে। কাজেই অনেক কিছু শিখতে হয়। কখন্ কোন বিদ্যা কাজে লেগে যায়, কে জানে!"

রমা—"আর কি কি শিখেছেন?"

কুমার—"ক্রমাগত ধমক খেতে শিখেছি—এখানে এসে অবধি কত ধমক খাচ্ছি।"

রমা—"আচ্ছা, তা না হয় খেলেন কিন্তু থালার ও বাটির ও সবটাই খেতে হবে; কিছু ফেলতে পারবেন না।"

কুমার—"তার অর্থ! আপনি আমাকে ভেবেছেন কি?"

রমা—"কিছুই ভাবি নি;—এবেলা-ই ত' চলে যাবেন, —আবার ত' খাবার জুটবে কাল বেলা ১২টার সময়…।"

কুমার—"অর্থাৎ আমি একটি আরব মরুর উষ্ট্র—দীর্ঘ মরু-

পথের সব খাদ্য পানীয় পূর্ব্বেই নিয়ে নেব? তবুও যদি বহন করবার কাউকে পেতাম—না হয় উটই হতে রাজী ছিলাম।"

রমা—"ওসব বাজে ফাজলামি চলবে না—ও সব-ই খেতে হবে। গরীব মানুষ—অনেক কষ্ট ক'রে পয়সা খরচ ক'রে বানিয়েছি—ওর এক কণাও ফেলতে পারবেন না।

কুমার—"যা থাকে কপালে—দেখি এবার লেগে যাই—বিদুরের খুদকুঁড়া ত ফেলতে নেই···।"

সে মনোযোগের সঙ্গে খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে হাসি হাসি মুখে বলল—"হে ইয়াকুট বীর, তোমার শরণ নিচ্ছি—আমার স্কন্ধে—না থুড়ি, উদরে—তুমি যেন ভর করো।"

রমা হেসে উঠল—"ও সব কি বলছেন?"

কুমার বলল—"আদিম কালে নাকি আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা—যখন খাদ্য সঞ্চয় ক'রে রাখার প্রথা হয় নি—তখন যেদিন যা পেত, খেয়ে নিত। কোনদিন ৮।১০ সেরের বেশীও হয়ত খাওয়া হয়ে যেত—পরে আবার কবে ভাগ্যে জুটবে, তার ত ঠিক ছিল না। শুনেছি কিছুদিন পূর্ব্বেও ইয়াকুট নামে আদি বাসিন্দাদের মধ্যে যেদিন কেউ একটা ভাল শিকার পেয়ে গেল—বাস্, বীরবর ১৫।২০ সের মাংস খেয়ে রাখল—আবার কবে কি মেলে কে জানে! আমারও আজ তাই করতে হচ্ছে। তাই সেই ইয়াকুট বীরদের স্মরণ করছি···।"

রমা হেসে বলল—"থাক। আপনার আর খেতে হবে না। আদৎ কথা হ'ল রান্না ভাল হয় নি, আর এসব বাজে খাবার আপনার মুখে রোচে না······।" এই কথা ব'লে রমা একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিল।

কুমার বলল—"এবারেই মাটি করেছেন; খুব মনোযোগের সঙ্গে এবং প্রতি পদের সুখ্যাতি ক'রে খাচ্ছি। এবার জেনে নিন—কুমার বড় সুবোধ বালক, যাহা পায় তাহা-ই খায়···।"

সে মাথা নীচু ক'রে খেতে সুরু করল। রমা গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইল। রমার কোন সাড়া না পেয়ে কুমার মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে রইল। সে বলল—"আপনি সত্যিই রাগ করলেন······!" সে অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখল রমার চোখ ছল ছল করছে। তার দিকে কিছুক্ষণ চাইতেই, রমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কুমার খাবার আসনে তেমনি বসেই রইল। ৭।৮ মিনিট পর রমা আবার ফিরে এল। সে চোখ-মুখ ধুয়ে এসেছে। চোখের পাতা তখনও ভিজা—কালো চোখের মাঝে তখনও অশ্রুচিহ্ন লেগে আছে। গলার আওয়াজ ধরা। রমা বলল—"বা, এখনও ব'সে আছেন!"

কুমার বলল—"ভরসা দেন ত জবাব দিই—আর যা-ই করুন রাগ করবেন না। আপনার অভিযোগ সত্য নয় এ আপনি জানেন। রান্না ভাল হয় নি তা-ও সত্য নয়; এ খাবার আমার মুখে রোচে না তা-ও সত্য নয়। যদি সত্যও হ'ত—যদি অতি কুপক্ব এবং কুখাদ্যও আপনি আমাকে দিতেন—আজ আপনার হাতে আমি প্রথম খাচ্ছি—আজ যে তাও আমি অমৃত মনে ক'রেই খেতাম।"

রমা নত মুখে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের মাথা মেঝের গায় ঘষতে লাগল। কুমার বলল—"বিশ্বাস করলেন না?"

তেমনি নতমুখে রমা বলল—"করি।"

কুমার—"তবে ও কথা বললেন কেন?"

রমা—"আমার অন্যায় হয়েছে—মাপ করুন।—এখন উঠে হাত-মুখ ধোন।"

কুমার—"তবে আর এত গম্ভীরভাবে কথা বলবেন না। ওটাতেই আমি সবচেয়ে ভয় পাই।"

মেঘ কেটে গেল; কুমারের কথার হৃদ্যতায় রমা খুসী হ'ল।

রমা মৃদু হেসে বলল—"মাগো, কি দুষ্টু আপনি হয়েছেন—আগে ত এমনি ছিলেন না!"

কুমার—"মাগো, কি দুষ্টুই আমাকে বানিয়েছেন—আগে ত এ রকম ছিলাম না সত্যিই……।" বলেই সে আবার খেতে সুরু করল।

সন্ত্রস্ত হ'য়ে রমা বলল—"ও করছেন কি? কি জ্বালাতনেই পড়েছি……। ও সব খাবেন না।"

কুমার—"এর মধ্যেই জ্বালাতনে প'ড়ে গেলেন—তা হ'লে ত বেঁচে যাই। কিন্তু আপনার হুকুম যে সব খেতে হবে—আর এ ১০।১৫ মিনিটে ক্ষুধাও একটু বেড়েছে—যে আগুন এতক্ষণ জ্বলছিল ভিতরে!"

রমা—"আচ্ছা এখন উঠুন, আর দুষ্টুমি করতে হবে না।"

কুমার—"তা ত উঠতে পারি না—ভোজন-দক্ষিণা না হ'লে উঠছি না।"

রমা—"মহা জ্বালাতন দেখছি, ভোজন-দক্ষিণা পিঠের উপর পড়বে।"

কুমার হেসে উঠল এবং নীচু হ'য়ে বলল—"এই নিন পিঠ পেতে দিয়েছি—"

রমা—"না, আপনার সঙ্গে আর পারি না।"

কুমার—"আচ্ছা আমিই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—এই আসন-খানা বোধ হয় আপনারই বোনা ?"

রমা—"হাঁ।"

কুমার—"তবে এটাই আমার ভোজন দক্ষিণা হ'ক—শ্রী হস্তের স্পর্শ দিয়ে তৈরী এবং শ্রীচরণের ধুলি দিয়ে পুষ্ট·····এবারকার মতো এতেই আমার চ'লে যাবে।"

উঠে দাঁড়াবার সময় কুমার বাঁ হাত দিয়ে আসনখানা তুলে মাথার উপর রাখল এবং গানের সুরে বলল—"হে শ্রীচরণের ধুলি তোমার পরে ছোঁয়াই মাথা।···"

হাসতে হাসতে সে বারান্দায় মুখ ধুতে গেল। রমা তার হাতে জল ঢেলে দিতে লাগল। কুমার বলল—"বাসায় ত ঝি একটা আছে···এ কাজটুকুও কি তাকে দিয়ে হত না!"

রমা কাঁধের উপর থেকে পরিষ্কার তোয়ালে কুমারের হাতে দিল—তার হাতে তখন তার নিজের শাড়ীর আঁচলও ধরা ছিল। কুমার তোয়ালে নেবার সময় আঁচলের অংশও মুঠার মধ্যে ধ'রে রাখল। রমা মনে করল কুমার না জেনেই ধরেছে—তাই সে আঁচল টেনে নেবার চেষ্টা করল না।

তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছে রমার আঁচলটুকু সে নিজের মুখের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে বলল—"অশিষ্ট ব'লে অখ্যাতি ত' হয়েই গেছে—আর নূতন কি হবে, তবুও এই অশিষ্টতাটুকু মাপ করবেন।"···একটু থেমে সে আবার বলল,—"আজকার দিনে এইটুকুই আমার পাওনা হ'ল ··। রাস্তায় ভিখারী কত সময় লোককে জ্বালাতন করে···বিরক্ত হ'য়ে একটা-আধটা

পয়সা কেউ ফেলে দেয়—কখনও বা ফাঁকি দিয়েও সে ২।১ পয়সা পায়। তাতেই তার দিন চ'লে যায়। দাতা বিরক্ত হয়েই দিক বা ফাঁকিতে প'ড়ে-ই দিক, তাতে ভিখারীর কিছু আসে যায় না।"

রমা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কুমারই শেষে বলল—"ঘরে চলুন।"

উভয়ে এল—রমা পান এনে দিল। কুমার বলল—"পান বানিয়ে দেবার লোক এখনও জোটে নি, সুতরাং ও অভ্যাসও হয় নি। তবুও আপনি এনেছেন ব'লে একটা খাব।" সে একটা পান তুলে মুখে দিল।

রমার সমস্ত চটুলতা ও চপলতা যেন লোপ পেয়ে গেছে—তার চোখ-মুখ ছলছল করছে—যেন জলভরা কালো মেঘ তার মুখের উপর এসে জমেছে—হয়ত এখনই বর্ষণ সুরু হবে।

কুমার বলল,—"না, আপনাদের নিয়ে মহা মুস্কিল—এমনি একটা উৎসব আমার মনের দুয়ারে, আর আপনি গম্ভীর হ'য়ে মুখে একরাশি মেঘ জড়ো ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন! দেবযানী কচকে অভিশাপ দিয়েছিল জানেন—

"…তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।"

দেবযানী নিজেদের প্রকৃতি দেখেই এই অভিশাপ দিয়েছিল—নারী অপরের মধ্যে কাব্য ও রসবোধ উদ্রিক্ত করে, কিন্তু নিজে ভোগ করতে পারে না।"

রমা—"যাক আপনার ও সব কথা। পথের জন্য ঐ

tiffin carrierটা নিয়ে যাবেন এবং ওখানে পৌঁছেই পৌঁছ-সংবাদ দেবেন··· ।"

কুমার—"দেখুন ত, এমনি একটা কাব্যালোচনা সুরু করেছিলাম, তার মধ্যে এনে ফেল্লেন tiffin carrier ও পৌঁছ-সংবাদ···অসম্ভব ! আপনাদের সঙ্গে কাব্য চলে না ; আপনাদের নিয়ে কাব্য লেখা চলে, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে ওর আলোচনা চলে না ।"

রমা—"তাতেই ত সুবিধা। কাব্য আলোচনার বিঘ্ন-স্বরূপ ত কাউকে সংগ্রহ করেন নি। দূর থেকে কাউকে নিয়ে মনে মনে বা খাতাপত্রে কাব্য রচনা করুন। কাজেই অভিযোগেব ত আপনার কোনই কারণ নেই—ভালই ত আছেন, জ্বালাতন জুটিয়ে লাভ কি ?"

কুমার—"আর ঝগড়া করব না—আমার সময়ও হয়েছে। কিন্তু tiffin carrierটা কি সত্যিই নিতে হবে ?" পেটে হাত বুলিয়ে সে আবার বলল—"এই ত একটি tiffin carrier সঙ্গেই আছে—সেই ইয়াকুট বীরদের স্মরণ ক'রে এতেই অনেক সংগ্রহ করেছি।"

রমা—"থাক্, আর বাজে কথা বলবেন না—flask-এ চা আছে। রাত্রে চা ও carrierএ সন্দেশ আছে—তাই খাবেন। ভোরের জন্য কিছু মিষ্টি ও লুচি আছে। flask-এ চা-ও থাকবে—রাস্তায় যেখানে সেখানে কিনে খাবেন না ।"

কুমার—"যথাজ্ঞা, কিন্তু এই রাখালী কেবল একদিন করলে লাভ কি—আমি যে বছরে অন্তত ছ'মাস ঘুরে বেড়াই —পথে-ঘাটে যেখানে যা পাই তাই খেয়ে নিই ।"

রমা—"বড় ভাল কর্ম করেন···।"

কুমার—"তা ত বলছি না।"

রমা—"তবে আর কি—লক্ষ্মীছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন —ঘর-সংসার করবার নাম নেই—কতদিন এমনি চালাবেন ?"

কুমার—"জানি না, বললাম ত waiting listএ আছি···।"

রমা—"কতদিন wait করবেন— ?"

কুমার—"জানি না মিস রায়; যদি কোন দিন দেবী তুষ্ট হ'য়ে দ্বার খোলেন, তখন হয়ত আমার ধন্না দেওয়া শেষ হবে। অথবা যদি কোন দিন আমারই স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় ··"

রমা—"তা যেতেও পারে।" তার গলাব স্বব একটু কেঁপে গেল।

কুমাব—"পারে বৈ কি! 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' লিখে বা হিমালয়ে সন্ন্যাসী হয়েও ত পরে আবার স্বপ্ন কেটে যায়, আমারই যে যাবে না তা কি ক'রে বলব! তবে এই প্রার্থনাই করি আমাব স্বপ্ন ভাঙ্গার আগে যেন জীবনের খেলাই শেষ হয়।"

রমা—"ছিঃ কি যে বলেন!" আবার তার স্বর কেঁপে উঠল। কুমার বিদায় নিয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ দবজার সামনে এসে বমা পথ রোধ ক'রে বলল—"একটু দাঁড়ান।"

সে হাঁটু গেড়ে কুমারের পায়ে প্রণাম করল—কুমার পা সরিয়ে নিতে গিয়েও পারল না! সে আস্তে রমাকে ধরে তুলল—"ছিঃ, এটা কি করলেন! আপনার আজকার বন্ধুত্ব আমার চিরকাল মনে থাকবে। আজ যা পেলাম তাই অনেক ভাগ্য ব'লে মেনে আরও অনেক কাল অপেক্ষা করতে পারব, মিস রায়।"

রমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল কুমার চ'লে যাচ্ছে··· বারান্দার একখানা থাম ধ'রে সে দাঁড়িয়ে রইল। শ্যামাভ্র সন্ধ্যার আভা তার শ্যাম তনুর উপর এসে পড়ছে···

হঠাৎ মনে পড়ল—এমনি একদিন অপরাহ্ণে পশ্চিম-দিগাগত সন্ধ্যার শ্যাম আভা তার মুখের উপর প'ড়ে নাকি কি এক অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করেছিল, যা দেখে কুমার মুগ্ধ হয়েছিল। কুমারই তাকে সে সব কথা বলেছে। সেদিনের শান্ত স্বল্পভাষী মেধাবী কুমার সেদিন রমার মুখশ্রী দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। অপরাহ্ণ-সূর্য্যের অপরূপ রশ্মি তার মুখে যে কমনীয়তার সৃষ্টি করেছিল, তা দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল।

পাশাপাশি গৃহে ২।৩ বছর এরা বাস করেছে—কোনদিন রমা বা অপর কারও দিকে সে আকৃষ্ট হয় নি। তার সমস্ত দেহে-মনে যৌবন উদ্গত হয়েছে ব'লে সে-দিন সে প্রথম অনুভব করল। যাকে অবলম্বন ক'রে তার দেহে-মনে যৌবন-প্লাবন এল, কুমার তাকে তার যৌবন-রাণী ব'লে অভিষিক্ত করল।

একবার ছুটিতে যাবার আগে কুমার রমাকে আলাদা ডেকে সরলভাবে নিজের মনের ভাব বলল। কুমার বলেছিল —"দেখুন, আমি আমার মনকে আজও চিনি না– আজ আমার মনে যে ভাব তা কি একটা ক্ষণস্থায়ী খেয়াল, না ভাবী সম্পদ, জানি না। এটা সত্যি ভালবাসা কি না জানি না। আজ আমার মনে হয় আপনাকে পেলে আমি সুখী হব; আজ আমাব মনে হয় আপনার জন্য আমি অনেক কাল অপেক্ষা করতে পারব। যদি আপনার জীবনে আমাকে কোনদিন চান, ডাক দেবেন। আমি কোন দাবী নিয়ে

আসি নি—কারণ আমার মনকে আমি আজও জানি না। এ খেলায় আমি একদম আনাড়ি। তবুও আমার কথা আপনাকে জানিয়ে গেলাম… ।”

ক্রুদ্ধ অপমানে রমা সেদিন কুমারকে আঘাত করেছিল—বলেছিল “আপনি যে এমন অশিষ্ট, এ আমি কল্পনাও করি নি।”

কুমার বলেছিল—“যত গাল আমাকে দিলেন, তার কোন প্রতিবাদ আমি করব না। বাস্তবিকই আমাদের সমাজের প্রথা অনুসারে আমার ব্যবহার অশিষ্ট ও অভদ্র। তবুও এটুকু বলব—আজকাল ছেলেমেয়েরা যেমন ঘনিষ্ঠ দোস্তালী ও বেহায়াপনা করে আমি অন্তত তা করি নি এবং করব-ও না। আমার আচরণে আপনি কোনরকমেই ঘনিষ্ঠতার অশোভন প্রয়াস বা ইতরামি পাবেন না। আপনার যাতে মর্যাদার হানি হয় এমন কোন আচরণ আমার দ্বারা হবে না, তা জানবেন। কারণ ওটা আমি নিজেরই মর্যাদার হানিকর ব'লে মনে করব।” এই বলেই ছোট্ট একটু নমস্কার ক'রে কুমার বেরিয়ে গিয়েছিল।

তারপর রমা সে কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল—অন্তত কুমারের আচরণে তার সেই দিনকার মনোভাবের আর কোন পরিচয়ই সে পায় নি।

বহুদিন চ'লে গেছে। তখন আন্দামান বন্দীদের প্রায়োপবেশন চলছে—কলিকাতার ছাত্র-ছাত্রীরা দল বেঁধে আন্দোলন চালাচ্ছে। কুমার কোনদিনই এ সবের মধ্যে প্রাধান্য করতে আসত না—বরং দূরেই থাকত। সেদিন দল বেঁধে ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। পুলিশের নিষেধ অগ্রাহ্য করেই তারা চলেছে। পুলিশ তাদের

বাধা দিচ্ছে--ওরা তবুও এগিয়ে চলছে। হঠাৎ একদল অশ্বারোহী পুলিশ চাবুক (hunter) নিয়ে ওদের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, আর ঘোড়ার উপর থেকে ওরা ত্বদিকে সমানে চাবুক, বেত, লাঠি চালালো। ছেলেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। হঠাৎ কুমার কোথা থেকে লাফিয়ে সামনে এসে চীৎকার ক'রে বলল--"লজ্জা করে না কাপুরুষের দল? চাবুক দেখে সব ভাগছ—মেয়েদের এমনি ক'রে ফেলে যাচ্ছ!"

তার চীৎকারে একদল ছেলে ফিরে দাঁড়াল। সার্জেণ্ট ও পুলিশের লাঠি ও চাবুক তাদের উপর সমানে চলল—কুমাব চীৎকার ক'রে মেয়েদের বলতে লাগল—"আপনারা আস্তে আস্তে ফুটপাথের উপর উঠে সরে দাঁড়ান।"

রক্তাক্ত দেহে পুলিশ তাকে ধ'রে নিয়ে গেল ;—বিচারে তার একমাস জেল হ'ল।

আজ মনে পড়ল রমার সেই দৃশ্য।

তারপরও ত্ব'বছর চলে গেছে। কুমার এম-এ পাশ করেছে। রমা এক স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হ'য়ে এসেছে। কুমারের কোন খবরই সে আর জানে না।

কিন্তু কুমাবকে সে ভুলতে পারে নি। তার মা তার বিয়ের চেষ্টা করেছেন—সম্বন্ধও এসেছে। বমা জানে সে স্নুন্দরী নয়—তবুও যারা তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, তাদের কাউকেই তার উপযুক্ত মনে হয় নি। তার প্রাণের সাড়া ঐ সব সম্বন্ধে আসে নি। কেন সে জানে না—তবুও সে অপেক্ষা ক'রেই চলেছে।

আজ মনে পড়ল তার অতীত জীবন ;—বারান্দায় একখানা ডেক চেয়ারে ব'সে পড়ে সে ভাবতে লাগল। ছোট বয়সে সে পিতৃহারা হয়। জীবনে কোনদিন সে মাকে সুখী দেখে নি। বাবাও মার উপর জুলুম করেছেন ;—বাবার মৃত্যুর পর মা রমাকে ও তার বড় ভাইকে নিয়ে এখানে ওখানে ভেসে বেড়িয়েছেন। দাসীর মতো অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে দুবেলা দুমুঠা ভাতের জন্য ওর মা কাকা, জ্যাঠা ও মামার এ-দুয়ার থেকে ও-দুয়ারে লাঞ্ছনা কুড়িয়ে ফিরেছেন। তখন সে দেখেছে সমস্ত পুরুষ জাতিই হিংস্র ও স্বার্থপর।

একটি বড় ভাই ছিল—সমস্ত পুরুষ জাতির মধ্যে ঐ একটি ছিল যাকে রমা ভালবাসত। তার আত্মোৎসর্গী পরিশ্রমের ফলেই রমা পড়াশুনা করতে পেরেছে। কয় বছর হ'ল সে মারা গিয়েছে। তাব মৃত্যুর কাহিনীও এক নিষ্ঠুর সমাজের কাহিনী—এবং সেই সমাজের বিধানকর্তা ও পরিচালক হ'ল পুরুষ। মা ও বোনের দুবেলার অন্ন জোগাবার জন্য যখন সে নিজের পড়াশুনা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করছিল তখন সে হ'ল অসুস্থ। তবুও তার বিশ্রাম নেই—ছুটি নেই। ৫।৬ বছর বিনা ছুটিতে দৈনিক ৯।১০ ঘণ্টা খাটুনির পরও যখন সে তিন মাসের বেশী বেতন সহ ছুটি পেল না, তখন রুগ্ন দাদার সমস্ত চিকিৎসার ভার পড়ল রমার উপর। কতখানে সে হাত পেতেছে, কোথাও এতটুকু সহানুভূতি সে পায় নি। বিবক্তির দান কোন কোন স্থানে পেয়েছে। তারপর প্রায় বিনা চিকিৎসায় ও বিনা পথ্যে তার দাদা মৃত্যুর কোলে বিশ্রাম নিয়েছে। তার সংসারের একমাত্র অবলম্বনকে এ

ভাবে হারিয়ে রমার সমস্ত বিদ্বেষ গিয়ে পড়েছে পুরুষ জাতির উপর।

এর পর এল কুমারের সেই ধৃষ্ট প্রস্তাব। তার মন তখন সমস্ত পুরুষের উপর ঘৃণায় ভরে ছিল। বিবাহ তার কাছে মনে হত পুরুষের কাছে নারীর ক্রীতদাসীত্ব। একমাস জেল খেটে বেরিয়ে আসার পর কুমারের সঙ্গে আর একদিন তার আলাপ হয়েছিল। তখনও তার সঙ্কল্প পুরুষ-সংসর্গ জীবনে বর্জন ক'রে চলবে। গত হু'বছরেও তার মনের ভাব বদলায় নি।

রমা বলেছিল—"দেখুন কুমারবাবু, আমার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকলে মৃত্যু পর্যন্ত আপনাকে সার্থকনামা হয়েই থাকতে হবে।"

কুমার বলেছিল—"তাই বা মন্দ কি! ক'জন জীবনে সার্থকনামা হয়? আশীর্ব্বাদ করি আপনিও যেন সার্থকনামা হতে পারেন—একেবারে নামের মূলগত অর্থসহ।

রমা—"ঐ ত দেখুন আপনাদের মন কোথায় কিসের অর্থ খোঁজে! পুরুষের মন এমনি ছোট।"

কুমার—"আপনার দাদাও ত' পুরুষ ছিলেন!"

রমা—"তাঁর কথা তুলবেন না। তিনি ছিলেন দেবতা।"

কুমার—"তা-ও পুরুষ; দেবী নয়—মা-মনসার জাতও নয়।"

রমা—"থাক, ও তর্ক ক'রে কি হবে! আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।"

কুমার—"অন্যত্র চেষ্টা করব কি না সে উপদেশ না-ই বা দিলেন; কিন্তু এখানে ত আমি কোন চেষ্টা করি নি।

দু'বছব আগে একবার বলেছিলাম। আজ একবার খোঁজ নিয়ে গেলাম। আবার হয়ত দু'বছর পরে একবার খোঁজ নেব।

রমা কিছু সময় চুপ ক'রে বসেছিল; পরে বলেছিল—"শুনেছিলাম, আপনার অন্যত্র সম্বন্ধ এসেছে; আমি ছাড়াও ত মেয়ে আছে।"

কুমাব—"সম্বন্ধ একটা কেন, কয়গণ্ডা এসেছে, এবং তাদের মধ্যে অনেকেই আপনার চেয়ে সুন্দরী, লেখাপড়াও সবাই জানে এবং অনেকেরই পিতা বেশ বিত্তশালী। মিঃ লাহিড়ীর মেয়ে সুধাকে জানেন ত? আরও দু'একটি হয়ত আপনার পরিচিতেব মধ্যে থাকবে।"

বমা একটু চিন্তা ক'রে নত মুখে বলেছিল—"তবে আর দেবী কবছেন কেন? সুধাকে আপনার পছন্দ হয় না?"

কুমাব—"নিশ্চয়ই হয়; আমার কোন প্রিয় বন্ধুর জন্য নিশ্চয়ই তাকে পছন্দ ও অনুমোদন করতাম। কিন্তু মিস্ বায়—এটা ত তৌলে তুলে ওজন করাব কথা নয়। আমি ত অশিষ্ট ও স্পষ্টভাবেই আমার কথা বলেছি—আমার অন্তর এখনও চায় আপনাকে।

দু' তিন মিনিট কেউ কোন কথা বলে নি।

পবে বমা উত্তর দিয়েছিল—"দেখুন কুমারবাবু, আমি সমস্ত পুরুষ জাতিকে ঘৃণা করি। আমাব ধারণা বিবাহ তাদের একটা ছল—নারীকে বোকা পেয়ে ক্রীতদাসী ক'রে রাখার কৌশলমাত্র। এই মন নিয়ে বিয়ে করা ত সঙ্গত নয়। আপনি আমার কাছে খোলাখুলিভাবে সব আলাপ করেছেন—এব জন্য আপনাকে অশিষ্ট বলি না। বরং সমকক্ষভাবে

আলাপের যোগ্য ব'লে মনে করেছেন,—এতে আমি তুষ্ট। আমাব জন্য অপেক্ষা করেছেন, এতে যে আত্মপ্রসাদ বোধ না করছি, তাও নয়। কিন্তু আমার জন্য আর অপেক্ষা না করলেই হয়ত সুখী হব। অনর্থক আমার জন্য আপনার জীবন নষ্ট করছেন কেন?"

কুমার বলেছিল—"বিয়ে সম্বন্ধে আপনি যা বললেন, anthropologically বা নৃতত্ত্বের দিক থেকে তা খুবই সত্য। বিবাহ প্রথার মূলে একটি ক্রীতদাসীকে economically exploit করার, আর্থিক হিসাবে কাজে লাগাবার বৃত্তি পুরুষের মনে প্রবল ছিল। কিন্তু সেই anthropology বা নৃতত্ত্বের দিক থেকেই যদি দেখেন, এতে মেয়েরাও সাহায্য করেছে। Matriarchal family বা মাতৃস্থান পরিবারের পর যখন patriarchal family বা পিতৃস্থান পরিবার এল, তখন মেয়েদের দাসীত্ব কেবল হাত বদল হ'ল;—পূর্ব্বে নারী দাসী ছিল ভাইদের, পরে হ'ল স্বামীর। স্থায়ী বিবাহ প্রথার সূচনাও এখান থেকেই ..।

"কিন্তু আজ ত মানুষ anthropological যুগে নেই। তার সংস্কৃতি, তার কাব্যবুদ্ধি, তার সৌন্দর্যবুদ্ধি দিয়ে সে তার anthropological instinct—তার আদিম মানব বৃত্তিকে—তার স্থূল অর্থবুদ্ধিকে অনেকখানি শোধন ক'রে নিয়েছে। নইলে আপনি চেষ্টা ক'রে এতটা লেখাপড়াও করতেন না, এতটা সাজসজ্জা এবং প্রসাধনের ব্যবস্থাও করতেন না। সবটারই মূলে রয়েছে—to look beautiful physically and mentally—and I may add, morally

too দেহে ও মনে নিজেকে রমণীয় করা এবং চরিত্রেও—এই ত আজকার নরনারীর একটা প্রধান সাধনা।…”

একটু থেমে কুমার আবার বলতে লাগল—“আজ আর থাক…যদি সম্ভব হয় এবং যদি তখনও আমার নিজের প্রয়োজন এমনি থাকে, আবার দু’বছর পরে দেখা হবে। কেবল, যাবার সময় একটা কথা ব’লে যাই—দু’বছর আগে বলেছিলাম, ‘আমি আনাড়ি—প্রেম ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, ঠিক বলতে পারি না আমার মনের ভাব স্থায়ী ভালবাসা, না সাময়িক খেয়াল।’ আজ বলে যাই—এটা অন্তত সাময়িক খেয়াল নয়—স্থায়ী ভালবাসা কি না তা আজও বলতে পারি না ……।

এখন যাই মিস্ রায়, নমস্কার…… ।”

দু’বছর পূর্ব্বে কুমার এমনি ক’রে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল।

রমার মনে পড়ল ঠিক দু’বছর পরে আজ আবার দেখা। তারই সঙ্গে দেখা করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের অতিথি হ’য়ে সে এসেছিল।

এই দু’বছর!…তার মনের আন্দাজ রমা আজও পায় নি।… কত ভেবেছে কোন কিনারা পায় নি। তার কোন বন্ধু নেই; বরাবর সে স্বাবলম্বী—তাই কারুর সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা হয় নি—তার কোন আত্মীয়ও নেই। তিন বছরের উপর সে এখানে এসেছে—মাসে দু’ এক খানা ক’রে মা’র পোষ্টকার্ড এসেছে; আর কোন চিঠিই তার আসে নি। কত শিক্ষয়িত্রী এখানে এসেছে;—যেন waiting house-এ—

বিশ্রাম কক্ষে দু'ঘণ্টা থেকে যার যেমন গাড়ী মিলেছে চ'লে গিয়েছে। বিয়ের মুখে এরা চাকরি ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে—কত আনন্দ তখন তাদের চোখে-মুখে, কথা-বার্তায়, চলা-ফেরায় ফুটে উঠত। দু' একটি বিবাহিতা শিক্ষয়িত্রীও আছে;—চিঠির জন্য কি উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা তাদের! আর সে নিঃসঙ্গ। —একটু অসুখ করলে সহানুভূতি দেখাবার কেউ নেই, সুখ-দুঃখের কথা শুনবার কেউ নেই···এ আর চলে না···।

এমনি সময় ঝি তার সামনে চায়ের সরঞ্জাম রেখে তাকে ডাকল।···

রাত এল—ভাল ঘুম হ'ল না। পর দিন মনটা ছটফট ক'রছিল—সত্যই কি কুমার পৌঁছ-সংবাদ দেবে! সত্যই কি একখানা রঙ্গীন চিঠির প্রত্যাশা সে ক'রতে পারে! আশা করতে ভরসা হয় না—যাকে অপমান করেছে—প্রত্যাখান করেছে, সে কি সত্যই তাকে চিঠি দেবে! সন্ধ্যার পর সরকারী উর্দিপরা পিয়ন এসে তার দরজায় ডাকল—টেলিগ্রাম হ্যায়, মাইজী।

সে ধড়ফড় ক'রে উঠল—টেলিগ্রাম! তাকে কে টেলিগ্রাম করবে!—তবে কি মার অসুখ করেছে!—ছুটে গিয়ে টেলিগ্রাম খুলল। কুমার টেলিগ্রাম করেছে—Reached safely, letter follows—নিরাপদে পৌঁছেছি—চিঠি লিখছি। নিজের চোখকে বিশ্বাস হলো না। ঘরে এসে সেই গোলাপী রঙের কাগজখানা চোখের সামনে খুলে ধ'রে ব'সে রইল। তার নিজের অন্তরেও আজ গোলাপ ফুটে উঠেছে—সর্বাঙ্গ তাই আজ কাঁটার জ্বালায় জ্বলছে।

তার নিজের ছোট উদ্যানে গোলাপ গাছের অনেক পরিচর্যা সে করেছে—কিন্তু তাদের জীবন-ইতিহাস ত সে কখনও পর্যবেক্ষণ করে নি। একটি গোলাপের কোরক কেমন আস্তে আস্তে ফুটে ওঠে। কচি পল্লব ও বোঁটার গায় কত অজস্র কাঁটাও সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে। সে আজ অনুভব করল কত ব্যথা ছোট গোলাপ গাছটির অন্তরে তখন বাজে। গোলাপ গাছ ফুল দেয়, সৌরভ দেয়, আনন্দ দেয়; তা-ই আমাদের লুব্ধ মন গ্রহণ করে। গোলাপ গাছের মৃদুল অঙ্গে কি ব্যথা জাগে তার খোঁজ কে নেয়! আজ নিজের ব্যথিত অন্তরের সঙ্গে তুলনা ক'রে গোলাপ বৃক্ষের অন্তরের ব্যথা সে অনুভব করল।

দিন কাটছে; একদিন, দুদিন ক'রে, পাঁচ দিন কেটে গেল—সে রোজই চিঠির প্রত্যাশা করে। তারপর একদিন বহু প্রত্যাশিত চিঠি এল—ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে সে চিঠি খুলে পড়তে বসল—

কুমার লিখেছে—

রমা,

প্রথমেই সম্বোধনের কৈফিয়ৎটা দিয়ে নিচ্ছি—আশা করি অশিষ্ট ব'লে গাল দেবে না। তোমার সেদিনকার বন্ধুত্ব ও প্রীতি এবং বিদায়কালীন তোমার উৎকণ্ঠা এই সম্বোধনে আমাকে সাহস ও উৎসাহ দিয়েছে। অন্তত বন্ধুত্বের দাবী করতে পারি ব'লে ভরসা হয় এবং সে দাবী উভয়ত। বয়সে ত ছোটই হবে।

এতদিন মনে করতাম হয়ত আমার ভাগ্য হবে "শুষ্ক-ঘন-গর্জিতে অন্তরীক্ষে জলপানম্ ইচ্ছতা চাতকায়"—জলহীন শুষ্ক মেঘের কাছে চাতকের জল প্রত্যাশা করার মতো ; কিন্তু আজ আমার আশা বাড়িয়ে দিয়েছ।

সেদিন আমার মৃত্যুর কথায় তুমি তীব্র প্রতিবাদ করেছিলে —বিদায় সময়······থাক—সে সব কথা আমার মনের গোপন মণিকক্ষের সম্পদ হয়েই থাক। আজও তা বাইরে প্রকাশ করতে চাই না।

জানো রমা, মৃত্যুকে এতদিন ভয় কবতাম না ; কেবল মা'র জন্য একটু ভয় করতাম। তিনি ত আর বেশী দিন আমাকে বেঁধে রাখবেন না। তারপর আমার এ জীবনের ত কোন বন্ধন ছিল না, কিন্তু তবুও এ জীবনের সঙ্গে সব শেষ হ'য়ে যায়—এটাও ভাবতাম না। একটা ফরাসী কবিতায় পড়েছিলাম—

"Mais rien. n'est mort peut-etre
Les morts et les vivants sont tous des
Fiance´s"

কিছুই বোধ হয় মরে না—জীবিত ও মৃত পরস্পরের বাগ্‌দত্ত। Ils s'accouplent এদের মিলন হয়—এরা-ই পরস্পরের দম্পতি —আর তাদের মিলন-আলিঙ্গনেই নাকি নব নব সৃষ্টির সূচনা হয়।

সমস্ত সমাজ গ'ড়ে উঠেছে এমনি মিলনের মধ্যেই ;—কত যুগ যুগ ধ'রে এ মিলন-ধারা চলেছে—আর ধাপে ধাপে সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছে—সেই সৃষ্টির কাজ ত শেষ হয় নি—

সে যে আজও চলেছে। তুমি রাগ ক'রে তোমার কাকা, জ্যাঠা বা মামাদের উপর বিদ্বেষ বশতঃ কি সে ধারা থামাতে পার ?

যে সভ্যতা আজ গ'ড়ে উঠেছে তার মূলে ক্রীতদাসের আর্থিক শোষণ (economic exploitation) অনেকখানি আছে। সে ক্রীতদাস পুরুষও ছিল, নারীও ছিল। জানো রমা, নারীই প্রথম ক্রীতদাস প্রথা সমাজে আনে। একদিকে নারীই বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে পোষা জন্তু করেছে,অপর দিকে বন্য পুরুষকে পোষ মানিয়ে পোষা ক্রীতদাস সে-ই করেছে। যে পুরুষকে অপর পুরুষ হত্যা ক'রে দু'চার দিন ক্ষুণ্নিবৃত্তি করত, নারী তার প্রাণ রক্ষা ক'রে তাকে দাস বানিয়েছে। এতে যে সবটাই নারীর অর্থবুদ্ধি ছিল — তাও নয়। কিন্তু এতে অর্থবুদ্ধি হয়ত অনেকটা ছিল। তার সঞ্চয়বৃত্তি—তার ঘর গুছানো বৃত্তি এর মধ্যে ছিল ; কিন্তু তার দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা দেবার বৃত্তিও ছিল। উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল পুরুষকে নারীই প্রথম শৃঙ্খলিত করে তার কোমল বৃত্তি দিয়ে ; নিজেও তাতে বাঁধা পড়ে। গাঁট-ছড়াতে কেবল একপক্ষই বাঁধা পড়ে না।

এ সভ্যতার অর্থ কি জানো ? আদিম কদর্যতা ও ক্রূরতাকে সুন্দর ও কোমল করা—মানুষের সুপ্ত কাব্যবুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলা। তাতেও নারীর স্থান কোন অংশে কম নয়। তিলোত্তমার সৃষ্টি-কাহিনী জানো ?—সমস্ত সৌন্দর্যকে তিল তিল সংগ্রহ ক'রে বিধাতা তাকে গড়েছিলেন। আমাদের সভ্যতাও যে তাই। যুগ-যুগের কাব্যবুদ্ধি, সৌন্দর্যবুদ্ধি এর মধ্যে সঞ্চিত আছে ; তবুও মানুষের স্বাভাবিক কদর্যতা এবং

ক্রূরতাও একদম ম'রে যায় নি। তাই সে মাঝে মাঝেই মাথা জাগিয়ে ওঠে।

সেটাকেই কি বড় ক'রে দেখবে—না, যুগ-যুগের সৃষ্টির বিজয়কে বড় ক'রে দেখবে? মানুষের, প্রথম যুগের ও বর্তমানে জন্মক্ষণের—দেহের ও মনের উলঙ্গতাই সত্য, না, প্রসাধিত, শোভিত ও মার্জিত দেহ-মন সত্য?

আজ আমার চারিদিকে বসন্ত তার লীলা-চঞ্চল লাস্যে মেতে উঠেছে। একে যে জীবনে অনুভব ক'রছি, এ কি শুধু আজকার বোধ দিয়ে—না কেবল আজকার বসন্তকেই চাচ্ছি! আজকার বসন্তের ভিতরে যে যুগ-যুগের বসন্তও ফুটে উঠছে—তাদের সমস্ত শোভা-সম্পদ নিয়ে আমার কাছে তারাও যে আজ ধরা দিচ্ছে।

"······dans ce printemps noveau,

Je sens tous mes printemps lontains qui refleurissent."

—আজকার বসন্তের মধ্যে আমার দূর-দূরান্তের সমস্ত বসন্তকে অনুভব করছি;—সেই অতীতের সব বসন্তই যে আজকার বসন্তে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

আর আজ কামনা করছি:

"······que s'y rallume ma vie

Que s'y rallume encore, ah que s'y consume ma vie."

—সেই বসন্তের আগুনেই আমার জীবন দীপ্ত হ'য়ে উঠুক—আবার জ্বলে উঠুক—আর সেই আগুনেই সে ভস্ম হ'য়ে যাক।

জীবনের বসন্ত

রমা, সৃষ্টিকে ধিক্কার দিও না। জীবনের বসন্তকে অস্বীকার করো না।

আশা করি পত্রের উত্তর পাব। আর···আর কি বলব··· যা দেবার—যা কামনা করার—তা আর কালো কালির আখরে প্রকাশ করতে চাই না—তা আমার রক্ত-লেখাতেই ফুটে উঠুক।"

রমা হু'চার লাইনের একখানা জবাব পাঠাল—

রাত্রির অবসান

ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে তাকে আসতে হয়েছে পূর্ব প্রান্তে - কেন সে জানে না। তরুণ যুবক সে ; পাঠানের রক্ত তার ধমনীতে ;—যৌবনের নেশায় তার রক্ত টগবগ করছে। পাহাড়ের গায় গায় সে ঘুরে বেড়াত ; তপ্ত রক্তের টগবগানীতে তার দেহ ও মন নেচে বেড়াত। সেও নেচে বেড়াত, সেই তালে তালে। একদিন তার শান্ত আফ্রিদী পল্লীতে "জির্গা"* বসল ;—গ্রামের খাঁ বলল লড়াইর জন্য পল্টন চাই—আরও পল্টন চাই। ৩০।৪০ বছরের সুস্থ সবল পুরুষ গ্রামে আর কেউ নেই। সবাই লড়াইতে গিয়েছে। কেউ গিয়েছে আফ্রিকার মরুভূমিতে। পাঠান, মোগল শিখ, জাঠ, দোংগড়া, রাজপুত—সবাই নিজেদের দেহের তাজা রক্ত দিয়ে আফ্রিকার মরুভূমির শ্বেত তপ্ত ধরণীকে রঙ্গীন ও সিক্ত করেছে। বার্দিয়া, তব্রুক, আলেকজেন্দ্রিয়া—প্রভৃতি কত স্থানের নাম সে শুনেছে।

ঐ সব সৈন্যদের বীরত্বের কত কাহিনী সে শুনেছে। মায়ার জাল সৃষ্টি হয়েছে তার চারিদিকে ;—এক সম্মোহনের অষ্টনাগ তাকে ও সমস্ত গ্রামকে নাগপাশে বেঁধে রেখেছে। যুদ্ধ—লড়াই—বীরত্বের আহ্বান…! সঙ্গে সঙ্গে আরও কত— পল্টন জীবনের কত সুখ-সুবিধা সে পাবে, ভাল খাবার, ভাল পরবার—আর কত টাকা আসবে গৃহে! খাঁ সাহেব

* পাঠান ও বেলুচি অঞ্চলে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মতো প্রতিষ্ঠান।

আরও কত কথা বলছিল—দুষমনকে হত্যা করতে হবে—দুষমন! দুষমন! তাঁর দুষমন, তাঁর পিতার দুষমন, উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের ও নিম্নতন চতুর্দশ পুরুষের দুষমন জার্মেনী. জাপান—তারও দুষমন। কোথায় জার্মেনী, কোথায় জাপান, সে জানে না। কোথায় তোব্রুক, কোথায় বার্দিয়া সে জানে না।···তবুও লড়াইয়ের আহ্বানে আর খাঁর নির্দেশে—তাদের জির্গায় খাঁ সাহেবের আশা ওভরসার কথায় তার তরুণ রক্ত নেচে উঠল। যুদ্ধের জন্য সে নাম লিখিয়ে এল।

জির্গা থেকে রহমান গৃহে ফিরে এল। গৃহে মা আছেন, চাচাত বোন মরিয়াম আছে। তারাও শুনল রহমান যুদ্ধে যাবে। পাঠান যুবক—সমর্থ জোয়ান সে—লড়াইতে সে যাবে—এই ত তাদের রীতি। কি ক'রে তারা একে নিষেধ করবে! নিষেধ করলে শুনবেই বা কে! খাঁ সাহেবের উপর নির্দেশ এসেছে এত সৈন্য এই গ্রাম থেকে দিতে হবে। কাজেই সৈন্য দিতেই হবে। তাদের নারী-হৃদয়ের উপর এই যে প্রতিকারবিহীন জুলুম—এর বিরুদ্ধে মুখের প্রতিবাদ জানিয়ে কেবল সমাজের কাছে তারা হাস্যাস্পদ হবে ত! তাই প্রতিবাদ-বাক্য তাদের মুখ দিয়ে বের হ'ল না কিন্তু হৃদয়ের দোলন ত তাতে থামল না। জিহ্বাকে সংযত করতে পারল; কিন্তু অন্তরকে রোধ করবে কি দিয়ে! তাই রহমান যখন বিদায় নিয়েছিল, তখন তাদের অন্তরের কথা বের হ'য়েছিল অশ্রুর আকারে। নব জোয়ান যোদ্ধা রহমান—দুষমন হত্যার স্বাদ তার রক্তে রক্তে মিশে গেছে;—ছোট দু'ফোঁটা চোখের জল কি তার চোখে পড়তে পারে! অন্তরের গোপন

কক্ষ থেকে বের হ'য়েছিল—সেই দুফোঁটা জল, গোপনেই তাদের গণ্ডে তা শুকিয়ে গেল।

সে মা'কে ব'লে গেল—বিজয় গৌরবে ফিরে আসবে মার কোলে। বাবা গিয়েছে, চাচা গিয়েছে, বড় ভাই গিয়েছে, ফুফা গিয়েছে, মামু গিয়েছে ··তারা-ও ফিরে আসবে; সেই সঙ্গে সেও ফিরে আসবে। কত জায়গা জমি তারা পাবে, কত টাকা পয়সা আসবে, কত উৎসব গৃহে হবে। মা তাকিয়ে রইলেন পুত্রের মুখের দিকে; ভবিষ্যতের ছবি তাঁকে সম্মোহিত করতে পারল না।—এই ত তাঁর জীবনে প্রথম নয়। তিনি পাঠান রমণী—এমনি কতবার দেখেছেন। তবুও বারে বারেই এমনি হচ্ছে।

কিন্তু · মা ভাবছেন কেবল—কে একজন শান্তির দূত তাদের দ্বারে দ্বারে এসে বলেছিলেন—না, না, ও-পথ নয়; ও পথে পাঠানের মঙ্গল হবে না। দীর্ঘ ঋজু বপু, তেমনি দীর্ঘ বলিষ্ঠ যষ্টি হাতে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তিনি চলেছিলেন। এক প্রৌঢ়া পাঠান রমণী তিনি, এক ক্ষুদ্র পার্বত্য পল্লীতেই তাঁর জীবন কেটেছে। পীর পয়গম্বর তিনি দেখেন নি; কোরাণ হদিস তিনি পড়েন নি। কিন্তু ঐ ঋজু তপঃক্লিষ্ট দেহে, সেই স্নিগ্ধ মুখমণ্ডলে, আর ঐ মুখের মধুময় বাণীতে কি যেন তিনি পেয়েছিলেন। শুনেছেন—তিনি ছিলেন খানখানান······বহুদিনের সে বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতি দুঃখের সংঘাতে মনে জেগে উঠল।—কোথায় আজ তিনি! দুর্বল মাতৃহৃদয়ের আজ বড় প্রয়োজন পড়েছে তাঁকে। পাঠানের ইজ্জতের কথাই যদি হবে—তবে তিনি পাঠানের খানখানান

হ'য়ে কি উল্টো কথা বলবেন! কোথায় আজ তিনি! কাছে পেলে মা একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন।

রহমান মরিয়ামকে ভবিষ্যতের রোমাঞ্চকর স্বপ্ন দেখিয়ে গেল। মরিয়াম আর রহমান—নূতন জগৎ সৃষ্টি করবে; ছোট্ট হবে তাদের সংসার—কেবল মরিয়াম ও সে—আর কেউ না। তারপর যখন তাদের গৃহে ছোট্ট একটি শিশু আসবে—তাদের উভয়ের কামনা দিয়ে তার তনু-মন গঠিত হবে—তখন সেই শিশুকে নিয়ে তারা যাবে আম্মার কাছে। বুড়ী আম্মা কত খুসী হবে। মরিয়াম মুগ্ধ অন্তরে সে সব শুনল। কিন্তু কোথায় যেন একটা সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এসে তার মন আঁধার ক'রে দিল। যুদ্ধক্ষেত্রের নিষ্ঠুর চিত্র তার মনে জাগল। দুর্জয় কামানের গর্জন,—এক একটা উড়ন্ত অনলপিণ্ড ছুটে এসে পড়ছে,—শত শত লোকের মৃত্যু-যন্ত্রণার দৃশ্য আবৃত হচ্ছে অনল-গোলকের ধূম্রজালে। আর তাদের মৃত্যুর কাতর ধ্বনি ডুবে যাচ্ছে কামানেব গর্জনে। মরিয়ামের অন্তর একবার শিহরিয়ে উঠল। তবুও যৌবনের মত্ততা ছিল তার মনে। তাই সেই ধূম্রজাল, সেই কামানগর্জন, সেই শত সহস্রের মৃত্যুদৃশ্য অতিক্রম ক'রে তার মন রহমানেব কল্পনার স্বর্গে বিচরণ করতে পারল। আশায় ও আশঙ্কায় তার অন্তর দুলে উঠল।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে বন্য ও পার্বত্যপ্রদেশে যুদ্ধের তাণ্ডব-লীলা চলছে। একটা কীট-পতঙ্গ মারতে মানুষের যতটুকু দরদ বোধ জাগে, শত শত হাজার হাজার মানুষ মরছে ততটুকু

দরদের উর্মি কোন অন্তরে না জাগিয়ে। মৃত্যু-দেবতার মন্দিরে আজ উৎসব লেগেছে।

……যুদ্ধক্ষেত্রে মরছে শতে শতে—অস্ত্রের হানাহানিতে, গোলাগুলির বিনিময়ে, সঙ্গীনের কোলাকুলিতে। যুদ্ধ লাইনের পিছনেও শান্ত নিরীহ জনতা মরছে—আকাশযানের অনল বর্ষণে।—শ্রান্তিহারী শান্ত রজনীর ক্রোড়ে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে, তখন নরঘাতকের গোপনতা ও হিংস্রতা নিয়ে আকাশ বর্ষণ করে মৃত্যুবাহী অনল। আরও পিছনে যারা, তারাও মরছে—খাদ্যের অভাবে, ঔষধের অভাবে, মন্বন্তরে ও মহামারিতে। তাই বলছিলাম, মৃত্যুর গৃহে আজ উৎসব লেগেছে। রহমান এসব চিত্র দেখেছে—মন্বন্তরের মড়ক দেখেছে, মহামারির মড়কও সে দেখেছে। সে দেখেছে পথ-প্রান্তে অনাথ নরনারী, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা একমুষ্টি ক্ষুধার অন্নের জন্য কুকুরবৃত্তি অবলম্বন করেছে। তাদের ক্ষুধার দৈন্য নিয়ে সে-ও খেলা করেছে; মানুষের প্রাণের দেবতাকে সে-ও অপমান করেছে—তার সৈনিক বৃত্তির দাম্ভিকতা ও প্রাচুর্য নিয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই তার অন্তরের মানুষ জেগে উঠে তাকে তিরস্কার করেছে। সে দেখেছে মানুষ না খেতে পেয়ে মরেছে, তার পায়ের কাছে প'ড়ে মরেছে, মনুষ্যত্ব বিক্রি করেছে—আত্মসম্মান বিক্রি করেছে—তার কাছেও করেছে, অন্যের কাছেও করেছে। উপরের আদেশে সে তাদের সাহায্যও করেছে। কিন্তু তা প্রাণের স্বচ্ছন্দ খেলায় নয়, যন্ত্রের অঙ্গহিসাবে যন্ত্রমালকের নির্দেশে। আবার তেমনি নির্দেশে নির্মম-ভাবে মানুষের দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনা

অপমানকে সে উপেক্ষা করেছে। এতটুকু মমতা তার মনে জাগতে পারে নি ;—সে সৈন্য—সে যুদ্ধযন্ত্রের অঙ্গ—সে'ত আর রক্তমাংসের, সুখদুঃখের মানুষ নয়।

এমনি ক'রে সে ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে পূর্বপ্রান্তে যুদ্ধ-প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছেছে। কোহিমা, দিমাপুর, বিষেণপুর, ইমফাল···কোন স্বপ্নেও এই সব নাম তার মনে জাগে নি। আজ সর্বস্ব-পণ করে সে এই অঞ্চলে লড়াই করতে এসেছে। তিন মাস হ'য়ে গেল এই অঞ্চলে তার পল্টন প্রেরিত হয়েছে। যুদ্ধের যেন বিরাম নেই। কাকে মারছে সে জানে না, কেন মারছে তাও জানে না। যুদ্ধের উন্মাদনায় সে মারছে ; যুদ্ধের অবসানে অবসাদে তার মন ভেঙ্গে পড়ছে।

সে বরাবর শুনে এসেছে, পাঠানরা হিংস্র। লুণ্ঠন ও নরহত্যা তাদের জীবনের অঙ্গ। হয়ত তা-ই ; কিন্তু আজ সে যা দেখছে, এই হিংস্রতার তুলনা কোথায়! পাঠান মারে প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে—প্রকৃতির কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষার জন্য। আর যুদ্ধক্ষেত্রে এরা মারছে বিনা প্রয়োজনে। কৃত্রিম দ্বেষ ও ঈর্ষাকে জাগিয়ে তুলে মানুষকে ক্ষিপ্ত পশু করা হ'চ্ছে—এই নরমেধ যজ্ঞের জন্য।

একবার রহমান অতীতের দিকে তাকায়—একবার দেখে বর্তমানকে—আবার দেখে ভবিষ্যৎ। সে বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। আজ তার মনে পড়ে মা ও মরিয়ামের চোখের দু'ফোঁটা অশ্রু। মার কুঞ্চিত কপোলের কুঞ্চন রেখায় সেই অশ্রুর ফোঁটা ক্ষণেক থমকে দাঁড়িয়েছিল ; তারপর পুত্রের রূঢ় দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হ'য়ে তা গড়িয়ে পড়েছিল। আর মরিয়ামের শুভ্র

নিটোল গণ্ডের উপর মাথা থেকে ঝুলে পড়েছিল কোঁকড়ানো কেশদাম ;—আর তারই আশ্রয়ে, কালো কেশের কোলে, মুক্তাবিন্দুর মতো সেই অশ্রুর ফোঁটা জ্বল জ্বল করছিল। ক্ষণে ক্ষণে সেই দৃশ্য মনে পড়ে, আবার তা ডুবে যায়, যুদ্ধের উন্মাদনায়। এমনি ক'রে তার দিন কাটছিল। তার পর এমন এক দিন এল, যখন স্মৃতির সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে পড়ল।

যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে দূরে বনবেষ্টিত এক ছোট্ট পর্বত উপত্যকায় সে চোখ খুলল। দেহে অসহ্য যন্ত্রণা। এক ফোঁটা জল··· কেউ নেই। আজ তার রাগ হল মার উপর, মরিয়ামের উপর—কেন তারা তাকে বাধা দিল না! তাদের অশ্রুর ভাষাকে তারা নীরবতার গহ্বরে কেন পিষে মারল! এক ফোঁটা জল, এক ফোঁটা জল!—কেউ নেই, এক ফোঁটা জল দেবার। হঠাৎ একটু দূর থেকে যেন মনুষ্য-অস্তিত্বের শব্দ আসছে। সে শুনেছে—দুষমন জাপানী অতি বর্বর, অতি নিষ্ঠুর। তাদের হাতে বন্দী হ'লে তার দুর্দশার একশেষ হবে।···না, না, বন্দী সে হবে না। বীরের বংশে তার জন্ম ;—বর্বর নিষ্ঠুর জাপানীর নির্যাতনের খোরাক সে হবে না।···কিন্তু ঐ কার শব্দ আসছে? ···এদিক ওদিক তাকিয়ে সে দেখল এক জাপানী সৈন্য। সে একটু ইতস্ততঃ করল ;—একবার মনে করল, তারই মতো আহত—আবার ভাবল হয়ত নয়। এক মুহূর্তে তার মন কঠিন হ'য়ে উঠল। অন্তরের মানুষ পড়ল ঘুমিয়ে, সৈনিক উঠল জেগে। দেবতা হ'ল নির্বাসিত, দানব হ'ল মন্দিরের অধিকারী।···

সে তার বন্দুক তুলে ধরল ; তা দেখে জাপানী সৈনিক প্রথমে হাত তুলল। ইতিমধ্যে তার বন্দুকের মুখ থেকে বেরিয়ে এল এক জ্বলন্ত গোলক ; জাপানীর উরুদেশে গিয়ে তা বিদ্ধ হ'ল। জাপানী সৈন্য তখন আহত ব্যাঘ্রের মতো লাফিয়ে পড়ল রহমানের উপর। তার হাতের সঙ্গীন গিয়ে বিদ্ধ হ'ল রহমানের দেহে।

মৃত্যু দূরে প্রতীক্ষমাণ ; দুই যুধ্যমান দুশমন তপ্ত শোণিত-ধারায় সিক্ত হয়ে পরস্পর জড়িয়ে প'ড়ে আছে। আর আঘাত করবার শক্তি কারোর নেই ; মনের সেই উষ্মাও নেই। রহমান একবার ক্ষীণস্বরে বলল—"আম্মা, মরিয়াম্...উবো..." তার শুষ্ক অধর জলের জন্য আপনা থেকে খুলে গেল। আহত জাপানী অতি কষ্টে কটিদেশ থেকে জলের বোতল বের ক'রে রহমানের মুখের কাছে ধরল।

অন্ধকার নেমে এল ; জলপান ক'রে রহমান একটু সবল হয়েছে। জাপানী দুশমনের সঙ্গে জড়িয়ে সে প'ড়ে আছে। এর কাতর ধ্বনি ওর কানে করুণ হ'য়ে ধ্বনিয়ে ওঠে। আবাব ওর কাতর কণ্ঠ এর হৃদয়ে ঝঙ্কার তোলে। রহমানের চোখের সামনেও অন্ধকারের পর্দা, তার মনের সামনেও ভবিষ্যতের অন্ধকার প্রাচীর। আজ তার অন্তিম সময়ে—সামনে মা নেই, মরিয়াম নেই—তৃষ্ণায় এক ফোঁটা জল দেবার আপন কেউ নেই ;—তখন এই দুশমন বর্বর জাপানী—যাকে সে আঘাত করেছে, সে নিজের জলভাণ্ডটি তার হাতে তুলে দিল। ...হয়ত তারও গৃহে এমনি ক'রে মা অপেক্ষা করছেন, হয়ত তারও জন্য কোন মরিয়াম প্রতীক্ষা করছে।...কি ক্ষতি করেছিল

এই জাপানী যুবক! এই কোহিমা, দিমাপুর, পালেল, টামু তার কাছেও যেমন অজ্ঞাত, এই জাপানী যুবকের কাছেও তেমনি অপরিচিত। কোন মিথ্যা ছলনায় তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। কি তার প্রয়োজন ছিল জাপানেব চেরী-ছায়া ছেড়ে এই নিবিড় জঙ্গলে পাহাড়ে প্রাণ দেবার!

রাত্রি গভীর হ'ল। চিন্তার জাল তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখছে।...এ থেকে তার বের হ'তে হবে। নিদ্রা, নিদ্রা—নিদ্রা চায় সে। মনকে ধমক দিয়ে নিদ্রার জন্য চোখ বুঁজে প'ড়ে রইল।...আহত জাপানী সৈন্যের দেহ তার দেহের সঙ্গে তখনও লেগে আছে।...কিন্তু দেহের সেই উষ্ণতা সে অনুভব করতে পারছে না। ..শীতল, শীতল লাগছে...একটু ধাক্কা দিয়ে সে জাপানীর দেহকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু... যেন একখণ্ড অসাড় প্রস্তর।...বুকে হাত দিয়ে দেখল স্পন্দন-হীন। তবে?...রাত্রির নিস্তব্ধতা মৃত্যুর আলিঙ্গনকে আরও নিবিড় ক'রে তুলল। না, না, সে জীবিত;...মৃতের আলিঙ্গন থেকে সে মুক্তি চায়। কিন্তু তবুও এই ত তাব বন্ধু;—সে তার শেষ সঞ্চয় জলপাত্রটী তার মুখে তুলে দিয়েছে। মৃত্যুকে মুখোমুখি ক'রে তারা উভয়েই দাঁড়িয়েছিল। আজ না হয় সে এক পা এগিয়ে গিয়েছে: তাই বলে কি বন্ধুর আলিঙ্গনকে সে এমনি ক'রে ঘৃণা করবে! আরও নিবিড় ক'রে তার দুর্বল বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। আজ মা নেই, মরিয়াম নেই...আছে কেবল মৃত্যুর দ্বারে প্রাপ্ত বন্ধু। মৃত্যু-পরিখার এপারে সে আছে; আর জাপানী সৈন্য ওপারে চ'লে গিয়েছে। পরিখা পারাপারের খেয়া ত

তার জন্যেও অপেক্ষা করছে। পার্থক্য ত কেবল কয়েক ঘণ্টার!

*　　*　　*　　*

পূর্ব গগন আলোকিত হ'য়ে উঠল। রহমান চেয়ে দেখল তার আফ্রিদী অঞ্চলের পর্বত-রাজির মতোই এখানকার পর্বত-রাজি নবারুণের কিরীট ধারণ করেছে। আকাশ থেকে আলোর ঝরণা ছড়িয়ে পড়ছে পর্বতশীর্ষে, সেখান থেকে ঠিকরে পড়ছে বৃক্ষচূড়ায়, আবার সেখান থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে পৃথিবীর বক্ষে। মৃত জাপানীর মুখে-চোখেও সেই আলোর ফোয়ারা পড়ছে। রহমান তাকিয়ে দেখল—তরুণ যুবক। মৃত্যুর স্পর্শ পেয়ে তার তারুণ্য যেন আরও স্নিগ্ধ, আরও কোমল হ'য়ে উঠেছে।

দিনের আলোয় তার কৃতকর্মের স্মৃতি স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। এই আহত সৈনিককে কেন সে আঘাত করল! কি দুশমনী এর সঙ্গে তার ছিল যার জন্যে আহত অবস্থায়ও একে আঘাত করতে সে ইতস্ততঃ করল না!···আম্মা, আম্মা, মরিয়াম!··· এর গৃহেও ত এমনি সব আছে। আজ তার মনে পড়ল সেই এক বিরাট পুরুষের কথা···যার আদেশে দলে দলে পাঠান বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে দাঁড়িয়েছিল গুলির সম্মুখে। আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করতে তিনি নিষেধ করেছিলেন—আঘাতের কাছে বীরের মতো বক্ষ পেতে দিতে বলেছিলেন তিনি।··· তাও ত পাঠানরা পেরেছিল। তার মন ছুটে চলল সেই উতমানজাইর শান্ত পল্লীতে।

গুড়ুম গুড়ুম···কামান গর্জন করছে। আবার যুদ্ধ সুরু

হ'ল। এর আর বিরাম নেই। গুড়ুম—গুড়ুম···কামান-গর্জন চলছে—আর সাথে সাথে উদ্গার করছে মৃত্যুর দূত।···শোঁ, শোঁ উড়ো-জাহাজ উড়ছে—যার গহ্বরে বোঝাই আছে মৃত্যুবাণ। আকাশ থেকে বর্ষিত হচ্ছে অগ্নি—যে আকাশ পূর্বে বর্ষণ করত অগ্নিনির্বাপণী বারিধারা।···কড়কড় ক'রে চলেছে ট্যাঙ্ক···তার বক্ষও ভর্তি আছে হত্যার অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। মৃত্যুর বাহন নিয়ে ছুটেছে সবাই।···আর সবাই ত তেমনিই চলেছে মৃত্যুর খেলায়! কেবল পরিবর্তন যা দেখছে, তা তার নিজের মধ্যে।···এই নূতন জীবনের স্বাদ পাবার জন্য তার বাঁচতে সাধ হচ্ছিল।··কিন্তু কে তাকে বাঁচতে দিচ্ছে! সে জানে মৃত্যু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। মৃত জাপানী সৈনিকের আলিঙ্গনে তারই সঙ্গে যে তাকে যেতে হবে মৃত্যুর নিকেতনে। তার উপর···দশদিক থেকে আসছে মৃত্যুর দূত। দশদিক থেকে ছুটছে অগ্নির সায়ক!···মৃত্যু, মৃত্যু···সে ভয় করে না তাকে। বাঁচবার জন্যও তার আকিঞ্চন নেই, মৃত্যুকেও সে ভয় করবে না। বাঁচতে সে চায়; নূতন জীবনকে ভোগ করতে চায়···এ সুযোগ সে পাবে না। আসছে মৃত্যু···আসুক, তাতে সে ভীত নয়। বীরের মতো বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে মৃত্যুর সম্মুখে সে দাঁড়াবে। হত্যাকে সে বীরত্ব বলে ভুল করবে না, বা হত্যাকারীর সামনে সে ভীত হবে না; তার মারণ-অস্ত্রের সামনে সে উন্মুক্ত বক্ষে দাঁড়াবে।

গুড়ুম, গুড়ুম···একটা অগ্নিপিণ্ড এসে পড়ল···তা থেকে শতখণ্ড অগ্নি-সায়ক ছিটকে ছুটে বেরুল। রহমান বক্ষ উন্মুক্ত করবার অবকাশও পেল না।

সব ছেয়ে গেল ধূম্রে ও অগ্নিতে। আকাশ পৃথিবী সব ডুবে গেল মানুষের হিংস্রতার সামনে।...কেবল চারিদিকে ছেয়ে রইল গুড়ুম গুড়ুম ধ্বনি আর সর্বব্যাপী ধূম্রজাল। মানুষ, পৃথিবী...সব ডুবে গেল তাতে।...প্রলয়ের বহ্নি-শিখা সৃষ্টিকে গ্রাস ক'রে ফেলল্।

কিন্তু তারও ঊর্ধ্বে রাত্রি অবসানের পর নূতন আলো পর্বত-শীর্ষ, বৃক্ষরাজি, আকাশ সবকে উদ্ভাসিত করছিল।...

শিল্পভ্রষ্ট

"দিল্লীশ্বরো বা" মোগল-সম্রাটের রাজধানী দিল্লীনগরীর শিল্পী মোহন। চোখে-মুখে তার শিল্পীর প্রতিভা; উদাস চাউনি,—যেন সব দৃশ্যমান পদার্থেরই বাস্তব ও বাহ্য রূপকে উপেক্ষা ক'রে সে তার ভিতরকার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে চায়। ব্যবহারিক জগতের কদর্যতা যেন তার দৃষ্টিকে ও মনকে স্পর্শ করতে পারে না। একের পর এক সে ছবি আঁকছে, কিন্তু কোনটাই যেন তার পছন্দ হয় না;—ফেলে রাখে তার শিল্প-সাধনা ঘরের কোণে অনাদৃতের স্তূপে। দশখানা ছবি সে যদি স্বুরু করে, কদাচিৎ একখানা তার কৃপণ অনুমোদন লাভ করে। এমনি ক'রে তার দিন চলছিল; গৃহে দারিদ্র্য, বাইরে উপেক্ষা, কিন্তু অন্তরে শিল্প-সাধনার দীপ্তি সততই জ্বলছে। সেই আলোতেই তার বাইরের সব অন্ধকারকে উপেক্ষা করার সামর্থ্য সে পেয়েছিল।

রাজধানীর জনতা তার শিল্পভবনে আসে; তাদের ফরমাস তাবা দিয়ে যায়। মোহনলালের লাজুক তুলি পারে না তা চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলতে। তারা যা চায় তা রেখায় ও রঙে ফুটিয়ে তুলতে তার তুলি সঙ্কুচিত হ'য়ে ফিরে আসে; আভাসে ও ইঙ্গিতে যা ফোটে তার চেয়ে বেশি যে তুলি যেতে চায় না। রাজধানীর বিলাসী ধনীরা ফিরে যায় প্রত্যাখ্যান ক'রে তার চিত্র। ব্যর্থ হয় তার কয়দিনের শ্রম।

* * * *

কিন্তু শিল্পী তন্ময় হ'য়ে আছে নিজের শিল্প-সম্ভারে; তার অন্তরের ঐশ্বর্য বাইরের দীনতাকে অস্বীকার ক'রে চলেছে। সমস্ত বাহ্য-জগৎ ভুলে সে তুলি ও চিত্রপট নিয়ে আছে।

সেদিন রাত ত্বপুরে শয্যা ছেড়ে সে গৃহের ছাদে পায়চারী করতে লাগল। একটা নূতন শিল্প-সৃষ্টিব নীহারিকার সন্ধান সে পেয়েছে। দূরে—বহুদূরে কোন নীহারিকা-স্তূপের মতো একটা শিল্প-দৃশ্য তার মনের আকাশে দেখা দিয়েছে। কিছুতেই যেন তাকে সে স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। এক একবার তার মুখ স্পষ্ট অনুভূতির আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে; আবার যেন হারিয়ে ফেলার বেদনায় ম্লান হ'য়ে পড়ে।

পূর্ব গগনে উষার আভা ফুটে উঠল; আকাশ-প্রাঙ্গণ রঙীন হ'য়ে উঠল প্রেয়সীর আগমনে। আকাশের গায়ে নগ্না উষা এলিয়ে পড়ছে, তার লুব্ধ ও লুব্ধক আলিঙ্গন নিয়ে—যেন প্রিয়া এসে আলিঙ্গনবদ্ধ হচ্ছে প্রিয়তমের সঙ্গে। নিরাভবণা নগ্না উষা—প্রেয়সীর মতো এসে আলিঙ্গন দিচ্ছে নগ্ন প্রিয়কে। দিনের আলোয় এই দৃশ্য যেমন ফুটে উঠবে, এমনি নীলাম্বর দিয়ে তাকে আবৃত করা হ'ল। ক্ষীণ নীলাম্বরের আববণ সেই মিলন-জ্যোতিকে ঢেকে রাখতে পারল না।

* * * *

নীহারিকাপুঞ্জ থেকে শিল্পী তার চিত্রকে মনের পটে পেয়েছে। তার চিত্র-কক্ষে গিয়ে সে বসল রঙ, তুলি ও পট নিয়ে।

আত্মভোলা চিত্রী তন্ময় হ'য়ে আছে তার চিত্র নিয়ে। আহার-নিদ্রার প্রয়োজন-জ্ঞানও যেন লোপ পেয়েছে তার।

একদিন গেল, দুদিন গেল: পটে রঙের রেখায় ফুটে উঠতে লাগল তার মনের ছবি। তিন দিন গেল, চার দিন গেল—তবুও শেষ হ'ল না তার অঙ্কন। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে চিত্রী আঁকছে। আভাসে-ইঙ্গিতে তার মনের ঐ ছবির ভিতর দিয়ে ফুটে উঠল রাধাকৃষ্ণের মিলন অথবা বিশ্বের চিরন্তন মিলন-পিপাসু প্রিয়-প্রিয়ার মিলন।

সাফল্যের ও তুষ্টির স্মিত-হাস্য নিয়ে চিত্রী বের হ'ল তার চিত্র-কক্ষ থেকে; মনে হ'ল যেন তার শিল্প-সাধনাব চরম পুরস্কার সে পেয়েছে। আশায় ও আনন্দে দর্শকদের সামনে উন্মুক্ত ক'রে ধরল তার চিত্র।

কেউ হাসল, কেউ বিদ্রূপ করল, কেউ প্রকাশ্যে নিন্দা করল। সমস্ত চিত্রের মধ্যে তারা না দেখতে পেল রাধা, না দেখতে পেল কৃষ্ণ। কেউ বলল অশ্লীল, কেউ বলল অর্থহীন। কেউ তার জন্য দুঃখ করল, কেউ তাকে দুটো সদুপদেশ দিয়ে গেল, কেউ করল তিরস্কার, কেউ বা মস্তিষ্ক-বিকৃতির চিকিৎসার জন্য বৈদ্য দেখাবার পরামর্শ দিয়ে গেল।

দিনের পর দিন কত লোক এল তার প্রদর্শনী-গৃহে; কেউ-ই ঐ চিত্রের ভাবোদ্দীপনার মর্ম গ্রহণ করতে পারল না। ব্যর্থতার পীড়নে চিত্রী গৃহের গোপন কোণে আশ্রয় নিল।

*　　*　　*　　*

এমনি ক'রে দিন চলছিল; একদিন তার আহ্বান এল এক সামন্ত-গৃহে। তখন বসেছে নওরোজের মেলা—সাম্রাজ্যের

সৌন্দর্যের পুষ্পোত্থান। তারই এক সুন্দরীর চিত্র আঁকতে হবে। সামন্তের পছন্দ হয়েছে সেই সুন্দরীকে; তাই তার চিত্র অঙ্কন করতে হবে।

চিত্রীর মন তখনও ভাবময়। যুবতীর দেহের অনুকৃতির চেয়ে তার মনের খেলা রেখায় ফুটিয়ে তুলতেই চাচ্ছে তার মন। নারীর রূপ—তা কি কেবল তার দেহের বাহ্যিক রেখায়ই আবদ্ধ আছে? শাস্ত্রকার বলেছেন, "রূপা ভেদাঃ প্রমাণানি"—প্রমাণের ন্যায় রূপের বহুভেদ। রূপ প্রতিরূপ নয়—প্রতিবিম্ব নয়—তার একটা নিজস্ব ছাপ আছে। পাষাণ খুদে শিল্পী দেবতার মূর্তি গড়ে—নিজেরই প্রতিরূপে। কেবল নিজের দেহের প্রতিরূপ দিয়ে নয়—নিজেব অন্তরের প্রতিরূপ দিয়েও।

নারীর সৌন্দর্যও কেবল পটে-আঁকা দেহের অনুকৃতিতে বিকশিত হয় না; চাই অন্তরের প্রতিরূপ। এই যুবতীর সৌন্দর্য ও অন্তরের প্রতিরূপই সে ফুটিয়ে তুলেছিল। কিন্তু পছন্দ হ'ল না—সামন্তেরও না, যুবতীরও না।

সামনে আর একখানা পটে আঁকা ছিল অর্ধসমাপ্ত নর্তকীর ছবি। যৌবনের মাদকতার সঙ্গে ছিল মূল্যবান অলঙ্কারের সজ্জা—আর ছিল মনের লালসা। সব মিলে নরকের দীপ্ত শিখা জ্বলে উঠেছিল তার দেহকে বেষ্টন ক'রে। নিজের প্রেয়সীর প্রতিলিপি হিসাবে—অল্প-সল্প বদল ক'রে—ঐ ছবিই সামন্তের পছন্দ হ'ল। হয়ত প্রিয়ার দেহের যৌবনশ্রীর সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য ছিল ঐ নর্তকীর দেহশ্রীর; হয়ত আভরণের প্রাচুর্য উভয়েরই সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিল;

হয়ত লালসার বহ্নি উভয়ের অন্তরেই সমান ভাবেই জ্বলছিল।

প্রিয়ার ছবি কিনে নিয়ে প্রিয়াকে উপহার দিল। প্রেমের মধ্যে লালসার জ্বালা যতই থাক, তার মধ্যে একটা অন্তরের সৌন্দর্যও যে ফুটে ওঠে—সেটা না হলে প্রেম হয় নিরর্থক; তা নর্তকীর ছবিতে থাকবে না। কি আসে যায় তাতে! দেহের সৌন্দর্য, মনের লালসা ও আভরণের প্রাচুর্য পেয়েই তারা সন্তুষ্ট। আর শিল্পী পেল প্রচুর পুরস্কার।

ছবি নিয়ে চ'লে গেল সেই ধনী সামন্ত; আর শিল্পীর হাতে রেখে গেল অর্থ। চক্‌চকে স্বর্ণমুদ্রা হাতে জ্বলে উঠল; চমক ভাঙ্গল শিল্পীর সেই স্বর্ণমুদ্রার জ্বালায়। এ যে তার শিল্প-সাধনার পণ্যমূল্য! ঐ ছবি আঁকতে সুরু করেছিল কোন শিল্পরূপকে অবলম্বন ক'রে—আর কি রূপের পোষাক পরিয়ে সে তাকে বিদায় দিল! মুহূর্তের দুর্বলতায় সে আজ সাধনাভ্রষ্ট। অভাবের পীড়ন তো বহুকালই ভোগ করেছে, কিন্তু আজ অর্থের লোভ! আর তার সঙ্গে এসেছিল বিরক্তি—অসংস্কৃত ধনী-মনোবৃত্তির প্রতি বিরাগ।

নটীর রূপ ও সজ্জা ঐ অসমাপ্ত চিত্রের বিষয়-বস্তু ছিল না; বিষয়-বস্তু ছিল নটীর অন্তর-নিবেদন—অন্তরের বেদনামিশ্রিত অর্ঘ্য। তার যৌবনশ্রী ও সজ্জা ত ছিল কেবল উপলক্ষ—তার ব্যথার থালি, যাতে ক'রে সে তার অন্তর-দেবতার পদে তার অর্ঘ্য সাজিয়ে দিবে। অমার্জিত ধনী সেই উপলক্ষকেই লক্ষ্য ব'লে নিতে চাইল! কি হবে এদের কাছে শিল্পের কথা

ব'লে! তার উপর পেল সে আশার অতীত অর্থ যার অভাব সে নিত্য ভোগ করে।

দিন যায়; রূপ ও সজ্জার চিত্রের গ্রাহক আরও আসতে লাগল। রূপ আর সজ্জা ফুটিয়ে তুলতে হবে রঙের রেখায়; তার বিনিময়ে সে পাবে প্রচুর পারিশ্রমিক। সমাজ যদি এই চায় তবে তাই হোক—প্রতিরোধের ক্ষমতা ত তার নেই! —কি সে করবে! শিল্পী ত সমাজেরই অঙ্গ—সমাজেরই দাস। তাদের যাতে তুষ্টি, তাই সে পরিবেশন করবে, শিল্পের স্বপ্নলোকে বাস ক'রে কি তার সার্থকতা!

তার স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল; তার স্বপ্নের স্বর্গ থেকে সে নেমে এল ধূলি-মাটির ধরণীতে। অর্থ, যশ, সম্মান এসে অভিভূত করল তার শিল্প-আত্মাকে। আস্তে আস্তে সে এলিয়ে পড়ল এক বিষাক্ত আলিঙ্গনের বন্ধনে।

* * * *

দিন চলছে; রাজধানী আজ মুখর শিল্পী মোহনের খ্যাতিতে। মোহনলালের অঙ্কিত ছবি আজ বহুলোকের গৃহসজ্জা করছে। অর্থও আসছে প্রচুর, যশও হয়েছে প্রচুর, সম্মান-প্রতিপত্তি আসছে সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে।

আজ আর মোহনলালের কোন অভাব নেই। কোন সুন্দরীর ছবি আঁকতে হ'লে সবাই যায় মোহনলালের কাছে। সকলেরই মুখে শোনা যায়—শিল্পী ত মোহনলাল। রাজ-দরবারে পর্যন্ত তার সম্মান। সাফল্য ও সার্থকতার প্রাচুর্যে সে আজ আত্মহারা। ভুলে গেছে সে তার শিল্পী সত্তাকে।

এককালে সে যে সত্যই শিল্প-সাধক ছিল তা-ও সে ভুলে

গেছে। বাহ্য সৌন্দর্যের প্রতিরূপ দিয়ে সে তার চিত্রপট ভ'রে ফেলেছে; আর তাই রাজধানীর ধনী ও অভিজাত মহলে সে শ্রেষ্ঠ শিল্পী ব'লে পরিগণিত হচ্ছে। সৌন্দর্য যে একটা অন্তরের অনুভূতি—কেবল বাহিরের বাস্তবের অনুকরণ নয়—এই বোধ রাজধানীর জনতারও ছিল না; তাই তাদের শিল্পীর মনেও তা থাকতে পারল না।

* * * *

এক শিল্পসভায় তার আহ্বান এল; হিমালয়ের পাদমূল থেকে এক শিল্পী তার এক চিত্র পাঠিয়েছে। শিল্পসভায় তারই প্রদর্শনী ও আলোচনা হবে। এই শিল্পী তারই সতীর্থ;—সে এসেছিল রাজধানীর মোহে, আর তার সতীর্থ গিয়েছিল শিল্প-সাধনার পীঠস্থল—হিমালয়ের পাদমূলে—পল্লীর শান্ত, স্নিগ্ধ ছায়ায়।

চিত্র উন্মোচিত হ'ল; চিত্রী এঁকেছেন—তপস্যারতা উমা চোখের উপর মদনভস্ম দেখে দৈহিক সৌন্দর্যের উপর আস্থাহীন হয়েছেন। প্রিয়তমের প্রেম যে সৌন্দর্য দিয়ে পাওয়া যায় না—কি মূল্য সেই সৌন্দর্যের! তাই তপশ্চরণের দ্বারা নিজের দৈহিক সৌন্দর্যকে অন্তরের সৌন্দর্যে সার্থক করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন; নইলে এমন পতি ও তার প্রেম লাভ করবেন কি ক'রে! কালিদাসের ভাষায় তা-ই প্রকাশ পেয়েছে ছন্দে—

"তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।
নিনিন্দরূপং হৃদয়েন পার্বতী প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।
ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ
অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং তথাবিধং প্রেমপতিশ্চ তাদৃশঃ।"

প্রথমে তার মন যাচ্ছিল সামান্য সুখ্যাতির সঙ্গে মিশিয়ে চিত্রখানার নিন্দা করতে। তার হিসাবী ও ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাকে সেই পরামর্শই দিচ্ছিল। কিন্তু যতই সে চিত্রখানার দিকে তাকাচ্ছিল, ততই যেন এক সম্মোহনী শক্তি তাকে আচ্ছন্ন করছিল। পরশ-পাথরের স্পর্শে তার সুপ্ত আত্মা জেগে উঠল—জেগে উঠল তাব শিল্প-বুদ্ধি। এই নবজাগ্রত শিল্প-চেতনাব সামনে তাব ঈর্ষা ও হিসাবী বুদ্ধি স্তব্ধ হ'য়ে গেল। বহুদিনের হাবানো ধন ফিবে পেয়ে সে যেন অভিভূত হ'য়ে পড়ল। মনে পড়ল দু'জনের এক সঙ্গে শিল্প-সাধনা; একই স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে থাকা। রাজধানীর আলেয়া তাকে টেনে আনল এই পঙ্কে; আব তার সতীর্থ গেল শিল্প সাধনাব সৌধশীর্ষে।

* * * *

গৃহে ফিবে গিয়ে আবাব নূতন ক'বে সে তার শিল্পী-জীবন গ'ড়ে তুলবাব সঙ্কল্প করল। বসল সে তার পট নিয়ে, তুলি নিয়ে, রঙ নিয়ে। কিন্তু কি সে চায়—আর কি ফুটে ওঠে তুলিব আগায়! ফেলে দেয় পট, ফেলে দেয় তুলি।

পরদিন আবার নিয়ে বসে;—পটে ফুটে ওঠে তার বহু অঙ্কিত নাবীদেহের অনুকৃতি। না, না—এই নাগপাশ থেকে তাব মনকে মুক্ত করতেই হবে। কিন্তু তার কল্পনাও যে আব সাড়া দেয় না শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণায়।

একদিন, দুদিন ক'রে ক'রে বহুদিন কাটল। সবই ব্যর্থ হ'ল। তাব চেতনা জাগ্রত হয়েছে—কিন্তু সৃজনীশক্তি ম'রে গেছে। মনের দরজায় এক একটা নূতন সৃষ্টি এসে কড়া

নাড়ছে; কিন্তু কে খুলে দেবে মনের বদ্ধ দরজা! মনের আকাশে নীহারিকা স্তূপাকার হ'য়ে আছে; কোন বৃহৎ আকর্ষণের অপেক্ষায় তারকারাজি ওর মধ্যে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সে আকর্ষণ আর আসছে না। রুদ্ধ সৃষ্টির এই যে লাঞ্ছনা ও বেদনা—কেবল ভুক্তভোগীই এর পরিমাপ করতে পারে।

ছটফট করছে মোহনলালের মন, সে চায় সৃষ্টি করতে—পারছে না তা। কুজ ও ম্যুজের মতো সৃষ্টির অপর দিক হ'ল—বিসর্জন, ধ্বংস। সৃষ্টিতে ব্যাহত হ'য়ে তার মন ছুটল ধ্বংসের দিকে—সে হ'য়ে উঠল শিল্পের কালাপাহাড়। নিজের শিল্প-প্রতিভাকে বিক্রি ক'রে যে অর্থ সে সঞ্চয় করেছিল, তা দিয়ে সে ক্রয় করতে লাগল শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন—শিল্প-জগৎ থেকে তাদের লুপ্ত করার জন্য।

এক উন্মত্ততা তাকে গ্রাস করল; দুষ্ট গ্রহের উন্মাদনার আবেগে সে শিল্প-জগতের এক মূর্তিমান উৎপাত হ'য়ে উঠল।

এমনি অবস্থায়· এক শিল্প-বিপণীতে চোখে পড়ল তার নিজের অঙ্কিত উষা ও আকাশের আলিঙ্গনের ছবি। সে চমকে উঠল সেই ছবি দেখে। নিয়ে এল সেই ছবি নিজ গৃহে। একদিন যাকে অবহেলায় বিদায় করেছিল, আজ তাকে সাদরে ফিরিয়ে আনল নিজ গৃহে। গুণীর দরবারে আদর পেয়ে সে ছবি হয়েছে মূল্যবান। তাই দোকানী প্রচুর সুখ্যাতি করল সেই চিত্রের এবং তার চিত্রীর; প্রচুর মূল্য আদায় করল তার জন্য।

* * * *

রুদ্ধদ্বার কক্ষ; নাতি-উচ্চ মঞ্চের উপর সেই ছবিখানা বসানো রয়েছে। তার সামনে ভক্ত পূজারীর মতো মুগ্ধ নেত্রে ব'সে আছে তার স্রষ্টা। সত্যিকার স্রষ্টা যে, সে গেছে ম'রে—তার কায়া আজ অতীতের স্মৃতি ও বর্তমানের ব্যর্থতা নিয়ে নিজ সৃষ্টির পাদমূলে ভক্ত পূজারীর মতো ব'সে আছে।

রাত ভোর হ'ল; প্রভাতের আলো চারিদিক আলোকিত করল। কিন্তু চিত্রীর কক্ষ তখনও তেমনি অর্গলবদ্ধ।

বাহিব হ'তে পড়ছে দরজায় ঘা···কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়াই নেই।

সবাই মিলে দরজা খুলে সেই কক্ষে প্রবেশ কবল। শিল্পীর প্রাণহীন দেহ প'ড়ে আছে চিত্রেব সম্মুখে—যেমন ক'বে দীন প্রার্থী দেবতাব পাদমূলে মাথা কুটে প'ড়ে থাকে।

দীক্ষা

পর্বতের নির্জন গহ্বরে বৌদ্ধ ভিক্ষু বিষ্ণুগুপ্ত ব'সে আছেন ;—তাঁর শিষ্য নাগসেন পাশে আছে। এমনি সময়ে সেখানে এল রাজভৃত্য চন্দ্রসেন।

চন্দ্রসেন বলল, "প্রভু, মহারাজ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন—আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার অনুমতি নিয়ে তাঁকে সংবাদ দেবার জন্য। অনতিদূরে বনপ্রান্তে তিনি লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করছেন।"

বিষ্ণুগুপ্ত বললেন, "মহারাজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন কেন? তাঁর বিশাল রাজ্যের একপ্রান্তে নির্জন পর্বতকন্দরে আমি দিন কাটাচ্ছি—আমার কাছে মহারাজের কি প্রয়োজন থাকতে পারে?"

চন্দ্র—"আমি তাঁর ভৃত্য ; কি প্রয়োজন তাঁর, আমি কি ক'রে বলব !"

বিষ্ণু—"আমি একটি দীন দরিদ্র ভিক্ষু নির্জন গিরিগহ্বরে প'ড়ে আছি, হঠাৎ মহারাজ আমাকে স্মরণ করলেন কেন ! এই গিরিগহ্বর তাঁর রাজ্যে অবস্থিত এবং এটা ভগবান তথাগতের মন্দির। যে কোন সময় তিনি আসতে পারেন ; আমার অনুমতির ত প্রয়োজন নেই।"

"তবে আমি গিয়ে মহারাজকে নিয়ে আসছি।"—এই ব'লে চন্দ্রসেন চ'লে গেল।

নাগসেন বলল, "মহারাজ আপনাকে স্মরণ করলেন কেন?"

বিষ্ণুগুপ্ত—"কি ক'রে বলব!—হয়ত রাজকার্যে এদিকে এসেছেন। এই নির্জন স্থানে গিরিগহ্বরে লোক বাস করে শুনে বোধহয় সাধারণ কৌতূহলের বশেই এখানে আসছেন।"

নাগসেন—"আমার কিন্তু মনে হয়, মহারাজ আপনার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আসছেন।"

বিষ্ণুগুপ্ত—"আমি একটি সামান্য ভিক্ষু, আমার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার কি আছে!"

ইতিমধ্যে চন্দ্রসেন ও মহারাজ এসে হাজির হ'লেন।

বিষ্ণুগুপ্ত উঠে মহাবাজকে বললেন, "এই দীনের কাছে হঠাৎ আপনাব আগমন কেন মহাবাজ? এটা ভিক্ষুর আশ্রম—আপনাব উপযুক্ত অভ্যর্থনা এখানে হ'তে পাবে না, কাজেই আশা করি, সে ত্রুটি আপনি নেবেন না।"

মহারাজ—"বুদ্ধং শবণং গচ্ছামি
ধর্মং শবণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি"

—ব'লে বুদ্ধদেবেব মূর্তিব সামনে ও ভিক্ষু বিষ্ণুগুপ্তের সামনে প্রণাম কবলেন। পরে বললেন, "দেব, বহুদিন যাবৎ আপনার খ্যাতি শুনছি, কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কবতে আসতে পারি নি।"

বিষ্ণুগুপ্ত বললেন, "মহারাজ, দীনের এই নির্জন গুহায় আপনার আসবাব প্রয়োজনও তো কিছু নেই। আপনার উপর বিরাট দায়িত্ব—এর গুরুভার আপনাকে বহন করতে হয়। তার ব্যাঘাত ক'বে কেন এখানে আসবেন! আমি

ভগবান বুদ্ধের একটি সামান্য সেবক, আমার দ্বারা আপনার কোনো প্রয়োজন সাধিত হ'তে পারে না।"

মহারাজ—"দেব, প্রয়োজন সাধনের জন্য আমি আসি নি—আমি এসেছি আপনাকে প্রণতি জানাতে এবং তার নিদর্শন স্বরূপ এই এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনার সেবার জন্য দিতে চাই—গ্রহণ ক'রে আমাকে কৃতার্থ করবেন কি?"

বিষ্ণুগুপ্ত—"স্বর্ণমুদ্রা! এই গভীর অরণ্যে নির্জন জীবন আমি যাপন কবছি, স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমি কি করব?"

মহারাজ—"দেব, আমি জানি এতে আপনার কোনই প্রয়োজন নেই, কিন্তু তবুও দিতে চাই, আপনার ইচ্ছামত ইহা ব্যয় করবেন।"

বিষ্ণুগুপ্ত—"কিন্তু মহারাজ, অর্থ ব্যয় করার আমার সুযোগ কোথায়? কোনো প্রার্থী এই ভীষণ অবণ্যে আসে না, নিজেব কোনো প্রয়োজন নেই।·· তবু যদি আপনি এই অর্থ দিয়ে সুখী হন, বেশ এই কোণে রেখে দিন।"

রাজা এক কোণে টাকা রেখে, আবার প্রণাম ক'রে চলে গেলেন।

* * * *

কিছুদিন পরের ঘটনা। সেই এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা গুহার সেই কোণে তেমনি অবস্থায় প'ড়ে আছে। নাগসেনের চোখে ওর দীপ্তি যেন পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠল।

নাগসেন নিজের মনে বলছে, "ঐ উজ্জ্বল দীপ্তিমান স্বর্ণমুদ্রাগুলি এমনিভাবে ধূলায় প'ড়ে আছে। আমার চোখে যেন ওরা একটা পীড়া দিচ্ছে। এই ভিক্ষু সন্ন্যাসীর এই

অর্থে কোনো প্রয়োজন নেই, অথচ কাউকে দিচ্ছেও না। যতই আমি দেখছি, ততই ওর প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে। ঐ অর্থ আমার চাই—আমার এতে প্রয়োজন আছে। হয়তো কেউ বলবে—আমি সব ত্যাগ ক'রে এসেছি, এই লোভ আমার কেন? কিন্তু তা তো সত্যি নয়। আমি তো এখনও ভিক্ষুর দীক্ষা নিইনি। আমি এসেছিলাম বিষ্ণুগুপ্তের কাছে—আজও তো আমাকে তিনি ভিক্ষু করেন নি। অথচ দিনের পর দিন আমি তাঁর সেবা ক'রে যাচ্ছি। প্রতিদানে আমি তো কিছুই পাই নি। তিনি না পেরেছেন আমার অন্তর পবিত্র করতে, না দিয়েছেন দীক্ষা।"

কয়েকদিন পরে আবার সে নিজের মনে বলতে লাগল—"না, এর একটা শেষ চাই। হয় আমার মনকে শুদ্ধ শান্ত ক'রে দিক, না হয় এব ব্যবস্থা আমি নিজেই করব। দিনের পর দিন আমি কেবল জ্বলছি—নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক'রে আর আমি পারছি না।"

এমনি সময় বিষ্ণুগুপ্ত বাইরে থেকে গুহার ভিতর এলেন! নাগসেন তাঁকে বলল, "দেব, বহুদিন আপনার এখানে আছি, আজও আমাকে আপনি দীক্ষা দিলেন না। আজ আমি দীক্ষা চাচ্ছি।"

বিষ্ণুগুপ্ত—"বৎস, তা তো সম্ভব নয়।"

নাগসেন—"কেন সম্ভব নয়? কতদিন যাবৎ আপনার সেবা করছি—আজও কি আপনাকে তুষ্ট করতে পারি নি?"

বিষ্ণু—"আমাকে তুষ্ট করার তো কথা নয়; তোমার মন

এখনও শুদ্ধ শান্ত নয়—আজও তুমি ভিক্ষুর দীক্ষার উপযুক্ত নও।”

নাগ—“আমি তো আমাকে আপনার কাছেই সমর্পণ করেছি, আজও যদি আমার মন শুদ্ধ শান্ত না হয়ে থাকে, তবে তার জন্য কি আমিই দোষী?”

বিষ্ণু—“তা তো আমি বলছি না। এর জন্য দায়ী সম্পূর্ণ ই আমি। যে দিন তোমার দায়িত্ব আমি নিয়েছি, সেদিন থেকেই তোমার সব ভাল-মন্দর দায়িত্ব আমার।”

নাগ—“যার জন্য দায়ী আপনি, তার দণ্ডভোগ করতে হবে কি আমার?”

বিষ্ণু—“কি করবে বৎস, অযোগ্যের হাতে ভার ন্যস্ত করেছ, কাজেই কিছু দণ্ড তো ভোগ করতে হবেই।”

নাগ—“ভণ্ড ভিক্ষু, তুমি তোমার নিজের মনের বিলাসে আছ, তাই জান না কি জ্বালা আমি ভোগ করছি। তুমি ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলছ—এদিকে আমার অন্তরে তুষের আগুন জ্বলছে। সমস্ত দণ্ড ও জ্বালা আমার বুকের উপর দিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি মুখে দিব্যি বলছ—তোমার দায়িত্ব, তোমার অযোগ্যতা। তাই যদি সত্যই মনে কর, তবে তার দণ্ডও তোমাকে নিতে হবে।”

বিষ্ণু—“দণ্ড, কি দণ্ড তুমি আমাকে দিতে চাও? দাও, আমাকে দণ্ড দিয়ে যদি তোমার মনের অশান্তি ঘুচে যায়, আনন্দের সঙ্গে আমি তা নেব। তোমার দণ্ড আমি মাথা পেতে নিতে রাজী আছি। দাও, কি দণ্ড আমাকে তুমি দেবে।”

নাগসেন নিকটস্থ একখানা ছুরিকা উঠিয়ে ভিক্ষুর বুকে একাধিক আঘাত করতে করতে বলল, "এই তোমার দণ্ড—"

রুধিরসিক্ত হ'য়ে সন্ন্যাসীব দেহ সেখানে প'ড়ে রইল—নাগসেন স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে চলে গেল।

পরদিন প্রভাতে সন্ন্যাসী জ্ঞান লাভ ক'রে উঠে বসেছেন -রক্তমোক্ষণে শরীব দুর্বল—ক্ষতের বেদনাও তাঁকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। একখানা বস্ত্রাবরণ দিয়ে তিনি সমস্ত ক্ষত ঢেকে দিলেন। নিজের মনে বললেন—"আমার অযোগ্যতার দণ্ড আমি পেযেছি। কিন্তু সে যেন মনে শান্তি পায়। প্রভু অমিতাভ, তাব মন শুদ্ধ শান্ত ক'রে দাও। আমাকে অবলম্বন ক'রে সে যেন জীবনে কোন বেদনা না পায়। আমার সমস্ত শরীরে একটা বিষেব জ্বালা বোধ করছি—যেন এ দিয়ে তার মনের সব জ্বালা মুছে দিতে পারি। প্রভু অমিতাভ—" ভিক্ষু ধ্যানস্থ হ'লেন। এমনি ভাবে তাঁর কয়দিন কেটে গেল।

কয়দিন পরে। তাঁর অপর এক শিষ্য আনন্দ এসে দেখে ভিক্ষু ধ্যানস্থ আছেন—গুহায় একটা দুর্গন্ধ—ভিক্ষুর ক্ষত থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। কিছু সময় পরে তাঁর ধ্যানভঙ্গ হ'লে আনন্দ তাঁকে প্রণাম ক'রে বলল—"আচার্য, আপনাকে রুগ্ন দেখাচ্ছে, অঙ্গে ক্ষতচিহ্ন—এ সব কি ক'রে হ'ল ?"

বিক্ষু—"বৎস, এ আমার অযোগ্যতার দণ্ড। নাগসেন রাজদত্ত স্বর্ণমুদ্রার লোভে দগ্ধ হচ্ছিল—আমি তার অন্তরকে শুদ্ধ শান্ত করতে পারি নি, অথচ তার দায়িত্ব তো আমি নিয়েছিলাম। তাই সেই অযোগ্যতার দণ্ড আমি তার কাছ থেকে যেচে নিয়েছি।"

আনন্দ—"নাগসেন আপনাকে এমনি ক'রে আহত করেছে—তা-ও অর্থের লোভে! আমি নিকটস্থ নগর কোতোয়ালকে খবর দিতে যাচ্ছি। এমন পাষণ্ডের দণ্ড হওয়া উচিত।"

বিষ্ণু—"না, বৎস, তা কোরো না। যে লাঞ্ছনা সে নিজের মনে ভোগ করেছে, তার উপর আবার রাজ-লাঞ্ছনা ও সমাজ-লাঞ্ছনা জুড়ে দিও না। এই কয়দিন যাবৎ প্রভু বুদ্ধের কাছে কেবল এই কামনাই করেছি যে, তার মন যেন শুদ্ধ শান্ত হয়ে যায়—যে শান্তির আশায় সে আমার কাছে এসেছিল এবং যে শান্তি আমি তাকে দিতে পারি নি, সেই শান্তি যেন সে এখন পায়। তার জন্য তুমিও প্রভুর পাদপদ্মে এই প্রার্থনাই করো।"

আনন্দ—"আপনি তবে তাকে ক্ষমা করেছেন?"

বিষ্ণু—"ক্ষমা করা আমার ধর্ম নয়।—তার কোনো অপরাধ তো আমার কাছে নেই; কাজেই ক্ষমা করার কোনো অধিকারও আমার নেই। আমি তাকে স্নেহ করি, তার শুভকামনা করি। তুমিও তাই করো।"

আনন্দ—"দেব, তাই করব—সে যেন সত্যিই জীবনে শান্তি পায়। আপনার স্নেহ ও শুভাশীষ যেন তার জীবনে সফল হয়।"

বিষ্ণু—"এখন তুমি এখান থেকে যাও, বৎস। এখানে তোমার থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। এই ক্ষত আমার দেহ'কে কিছু যন্ত্রণা দিচ্ছে—সেটা ভুলে থাকার একমাত্র উপায় হ'ল ধ্যানস্থ হ'য়ে থাকা। তাই বলছি তুমি যাও।"

আনন্দ—"আচার্য, আপনাকে একা এই অবস্থায় রেখে চ'লে যেতে বলছেন !"

বিষ্ণু—"হাঁ, তাই বলছি। আমার তো কোনো প্রয়োজন নেই, আনন্দ। আমি ধ্যানস্থ হ'য়ে দেখি প্রভু অমিতাভ আমায় ডাকছেন। তিনিই আমার কাছে আছেন। তাই বলছি, এখানে তোমার করবার কিছুই নেই।"

ভিক্ষুকে প্রণাম ক'রে আনন্দ চলে গেল।

ভিক্ষু ধ্যানস্থ ব'সে আছেন—হঠাৎ ধ্যান থেকে জেগে উঠে বলছেন, "প্রভু অমিতাভ, দেব, তুমি আমায় ডাকছ! প্রভু, তোমার দয়া হয়েছে—আমার সমস্ত জীবনের ব্যর্থতাকে আজ ব্যথার দাহনে শুদ্ধ ক'রে তুমি আমাকে গ্রহণ করো।"

ভগবান অমিতাভের ছায়ামূর্তি ভিক্ষুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলছেন, "বৎস, তোমার জীবনের সমস্ত সাধনা পূর্ণ হয়েছে—তাই তোমাকে নিয়ে যেতে আমি এসেছি। সপ্তম স্বর্গে তোমার স্থান হবে।"

বিষ্ণু—"দেব! না, আমি তো এখনও যেতে পারছি না—আমার যে কাজের বন্ধন এখনও ছিন্ন হয়নি।"

ছায়া—"কি কাজ তোমার বাকী আছে? কোনো বন্ধন তোমার থাকবে না—আমার সঙ্গে চলো।"

বিষ্ণু—"প্রভু, আমাকে ক্ষমা করো—আমি এখনও যেতে পারছি না। নাগসেন ফিরে আসবে। তার অন্তরে শান্তি-বিধান না ক'রে আমি তো যেতে পারি না, প্রভু।"

ছায়া—"সেই গুরুদ্রোহী অর্থলোলুপ পাষণ্ডের জন্য তুমি

এখানে প'ড়ে থাকবে? আমার আহ্বান তুমি তার জন্য প্রত্যাখ্যান করবে?"

বিষ্ণু—"দেব, মাপ করো আমাকে। আমি জানি নাগসেন কি শাস্তি আজ ভোগ করছে। অথচ একদিন সে নিজেকে আমার কাছে ছেড়ে দিয়েছিল;—আমিও তার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। তার সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব আজ তাই আমি এড়াতে পারি না। প্রভু, আমাকে ক্ষমা করো—আমি জানি সে আসবে। সে পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।"

একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বললেন, "ঐ সে এসেছে। তুমি শুনছ না তার বিলাপ? ঐ শোনো ঐ শোনো, সে কাঁদছে। আয় বৎস, আয় ফিরে আয়—"

দূরে নাগসেনের বিলাপ শোনা যাচ্ছে—"গুরুদেব, আমি পথ পাচ্ছি না, চলতে পারছি না; কে আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে!............"

বিষ্ণু—"ঐ শুনছ, সে আসছে—আসছে......"

আবার নাগসেনের কণ্ঠস্বর—"যে পথ দিয়ে দিনে কতবার চলেছি, আজ সে পথ আমার কাছে অজ্ঞাত—কোথায় কোন্ গুহায় তুমি আছ প্রভু—কে আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে!..."

বিষ্ণু—"প্রভু অমিতাভ,—দেব, তুমি কি তাকে এটুকু দয়া করবে না?—আমি যে চলতে পারছি না, প্রভু। যাও দেব, তুমিই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এস।"

আবার নাগসেনের কণ্ঠস্বর—"আজ আমার সমস্ত মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি যেন অবশ হ'য়ে গেছে। আমার সর্ব সত্তাকে

যেন ছেয়ে রেখেছে পাপের বোঝা ও অনুতাপের জ্বালা। গুরুদেব, দয়া করো—ব'লে দাও আমাকে কোথায় তুমি আছ, কোন্ গুহায় তোমার দেখা পাব।.... ..”

বিষ্ণু—“দেব........ ...”

ছায়া—“তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ কবব – যাচ্ছি, তাকে নিয়ে আসছি।”

ছায়া বেরিয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে নাগসেনকে নিয়ে ফিবে এলেন। নাগসেন দৌড়ে গিয়ে ভিক্ষুব পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল। ভিক্ষু তাব লুণ্ঠিত মস্তকে একখানা হাত বেখে বললেন, “তুমি এসেছ, বৎস, যে দীক্ষা সেদিন তোমাকে দিতে পাবি নি, আজ সেই দীক্ষা তোমাকে দিচ্ছি। বল—

বুদ্ধং শবণং গচ্ছামি
ধর্মং শবণং গচ্ছামি
সংঘং শবণং গচ্ছামি।”

নাগসেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে গেল। সাথে সাথে ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল। মন্ত্র উচ্চাবণেব সঙ্গে সঙ্গেই ভিক্ষুব আত্মা দেহ ত্যাগ করল।

বিষ্ণুগুপ্তেব প্রাণহীন দেহের সামনে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে নাগসেন আর্তস্বরে বলতে লাগল, “গুরুদেব, আমাকে ক্ষমা ক'রেই চলে গেলে!..... ......”

———

মার বেদনা

পরিমল সমস্ত দিন ঘুরে ফিরে সন্ধ্যার অল্প পূর্বে বাসায় ফিরছে। পা আর চলছে না; কোন্ মুখে সে গৃহে ফিরবে! শহরের এক প্রান্তে দু'খানা খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে তারা আছে। যে সামান্য উপার্জন তার আছে, তাতে মাসের ১৫ দিনেরও খোরাকি হয় না। আজ কয়দিন যাবৎই আধপেটা খেয়ে তাদের দিন কাটছে। কাল খেয়েছে মাত্র জনপ্রতি কয় পয়সার মুড়ি। খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ তিনগুণ হয়েছে। যে আয়ে কোনক্রমে একমাস চলত, সেই আয়ে আজ ১৫ দিন চালানো কঠিন হচ্ছে। তার উপর অসুখ-পীড়াও বেড়েই চলছে। বৃদ্ধ পিতা অসুস্থ হ'য়ে প'ড়ে আছেন, না জুটছে তাঁর ঔষধ না জুটছে তাঁর পথ্য।

সমস্ত দিন ঘোরা-ফেরা ক'রে সে আজ দু'টি টাকা সংগ্রহ করেছে। পিতার জন্য কিছু সাগু-বার্লি, কিছু অন্যান্য পথ্য, নিজেদের জন্য দেড় সের চাউল—ঐ নিয়ে সে গৃহে চলছিল। পথে এক কঙ্কালসার নারী, বক্ষে একটি মৃতপ্রায় শিশু, কোলের পাশে আর একটি সন্তান; সেই নারী বলল—"বাবু ম'রে যাচ্ছে,—খাবার অভাবে ম'রে যাচ্ছে এরা। দু'মুঠো খাবার দিন—আমি চাই না, এদের জন্য চাচ্ছি।......"

পরিমল মুখ ফিরিয়ে বলল– "না, পাবে না, চ'লে যাও।"

কিন্তু সেই নারী যেন তাকে ছাড়তে চায় না; চলতে পারে না, তবুও সে পরিমলের পিছন পিছন ছুটছে। বিরক্ত

হ'য়ে পরিমল ধমক দিয়ে বলল—"রাস্তা দিয়ে ত আরও কত লোক যাচ্ছে—তাদের কাছে যাও, আমি কিছু দিতে পারব না।······"

নারী বলল—"না বাবু, সবাইর কাছে ত ভিক্ষা চাওয়া যায় না, আপনার দয়ার শরীর বাবু।······আমিও বরাবরকার ভিখারী নই। আজই আমি ভিখারী হয়েছি।······এদের বাঁচতে দিন বাবু। আপনাদের ত অনেক আছে। ··"

এর হাত এড়াবার জন্য পরিমল একটু দ্রুতগতিতে চলতে লাগল। অনাহার-ক্লিষ্টা নারী আর তাল রাখতে পারছে না; রাস্তার পাশে ব'সে পড়ল। মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন পিছন পিছন চলল। তার মনে হচ্ছিল তার দেহের সব রন্ধ্রই শ্রবণদ্বারে পরিণত হয়েছে। আর যেন প্রতি লোমকূপ দিয়েই ঐ নারীর করুণ ক্রন্দনধ্বনি তীরের মতো তার সর্বদেহ ভেদ করছে –সব তীরাগ্র গিয়ে ফুটছে তার অন্তরে।

সে ফিরে এসে চাউলের ঠোঙ্গাটা ঐ নারীর সামনে রেখে বলল—"এই নাও···এবার হ'ল ত। যাও, গিয়ে খেয়ে মর···।"

সে আর দাঁড়াল না; ক্ষিপ্রতর গতিতে সেখান থেকে চ'লে গেল। কিছু দূর যাওয়ার পর সে তার সম্বিৎ ফিরে পেল। কি কবল সে!···গৃহে গিয়ে কি বলবে! পিতার পথ্য তবু ঐ সঙ্গে ফেলে দেয় নি। মা মুখটি বুঁজে থাকেন—পাছে পরিমল মনে কষ্ট পায়। ছোট ভাইবোনগুলো পেটের ক্ষুধা চেপে রাখে। দিক্‌চক্রবালের ঠিক বাইরে কালো অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে;—যেন তার গাঢ় ছায়া এদের সকলের মনের

উপরও আধারের প্রলেপ লেপে দিয়েছে। তাই ঐসব কিশোর বয়সী ভাই-বোনেরা পর্যন্ত ক্ষুধার জ্বালা মনে গোপন রাখছে। হয়ত নিজেদের অজ্ঞাতে তারা জানতে পেরেছে —আরো দুঃখের দিন সামনে আসছে। পরিমল শিক্ষিত; বিশ্বের সংবাদ সে রাখে। সে জানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তা ও নিস্পেষণ, যুদ্ধের দাবী সব মিলে এমনি যোগাযোগ ঘটিয়েছে যে অতি দুঃখের দিন সুনিশ্চিতভাবে দেশের উপর এসে পড়েছে।

কিন্তু আজ সে কি ক'রে বাসায় যাবে! তাদের কাছে গিয়ে কি সে বলবে! মা-বাপ, ভাই-বোনের ক্ষুধার অন্ন পথের ভিখারীকে বিলিয়ে দিল:—দরিদ্রের জীবনে এই দাক্ষিণ্য কেন? দেহ অবসন্ন, মন ক্লান্ত—কি বিড়ম্বনাময় তার জীবন, উচ্চশিক্ষা সে পেয়েছে, পরিশ্রম করতে সে প্রস্তুত; তবুও দু'বেলার খাবার সে উপার্জন করতে পারে না। রাষ্ট্র তার নয়; সুখ দুঃখের বিষয়ে উদাসীন সমাজ নিথর নিদ্রায় মগ্ন। লোকের সুখ-দুঃখের খোঁজ রাখবার মতো শ্রবণ ও মন এর নেই। রাষ্ট্র দেখছে তার রথচক্র ঘড়-ঘড়িয়ে চলছে কি না, —কেউ যদি তার রথচক্রের নীচে প'ড়ে পিষ্ট হয়—কি আসে যায় তাতে! সমাজ দেখছে তার সনাতন গৃহের সব গবাক্ষ বন্ধ আছে কি না;—ভিতরের জীবরা যদি আলোবাতাস বা খাদ্যের অভাবে শুকিয়ে মরে, কি ক্ষতিবৃদ্ধি তাতে, অর্গল যদি শিথিল না হয়!

গোধুলির মেটে আলোটুকু মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে গৃহে ফিরতে পারল না। অন্ধকারের আবরণে সে যখন

গৃহে ফিরল—তখন ভাই-বোনরা দুটা মুড়ি খই খেয়ে শুয়ে পড়েছে—ক্লান্ত অবসন্ন দেহ-মন ঢেলে দিয়েছে নিদ্রার ক্রোড়ে। মা তখনও জেগে আছেন। সাগ্রহে তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিছু এনেছিস ?" অস্ফুট কণ্ঠে কি যে জবাব সে দিল তা নিজের কানের কাছেই ধরা পড়ল না। কিন্তু বাক্য অস্ফুট হলেও, অর্থ প্রকাশের পক্ষে তা-ই ছিল পর্যাপ্ত—ঠিক যেমন শিশুর অনুচ্চারিত ভাষা মনের কথা মাকে জানিয়ে দেয়। একটি তিরস্কাব বাক্যও তিনি বললেন না ;—মৌন ম্লান মুখে তিনি দরজার সামনে ব'সে পড়লেন। পরিমলও মার পদপ্রান্তে ব'সে সব কথা মাকে বলল ; পরিশেষে সে বলল—"মা, খুব বাগ করলে ?"

মা বললেন—"না, রাগ করব কেন ? পবিমল, এত অবিবেচক তুই হতে পাবিস, আমি ভাবিনি। কাব মুখের গ্রাস তুই এমনি ক'রে বিলিয়ে দিয়ে এলি ? বাপ-মাকে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত দেবার যোগ্যতা যার নেই, এ সব কি তার সাজে ? ..."

এরপর দুদিন পর্যন্ত মা আর পরিমলের সঙ্গে ভাল ক'বে কথা বলেন নি। তৃতীয় দিন তার বিনয়দা এসে মার হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে গেল। আবও অনেক কথা সে মাকে ব'লে গেল।

দিন তাদের এমনি ক'রে অর্ধাহারে ও অনাহাবে কাটছিল। তখনও ১৩৫২ সাল চলছে। গত বছরের বন্যা ও প্লাবনে প্রচুর শস্যহানি হয়েছে ; ব্রহ্মদেশের চাল বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। যুদ্ধের বাড়তি খরচ ছাড়া খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও বেড়েছে

প্রচুর। এর উপর চলছে সরকারের নিষ্পেষণ—কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে হবে। দেশের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের যে প্রতিষ্ঠান আছে—তাও যেমন মুছে ফেলতে হবে, মানুষের মনে তার যে অধিষ্ঠান আছে, তাও ঘ'ষে তুলতে হবে। একদিকে সাম্রাজ্যিক যুদ্ধের রথচক্র; অপরদিকে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার রথচক্র; আর এর উপর দূরে শুনা যাচ্ছে—মহাকালের রথচক্রের শব্দ—মন্বন্তর ও মহামারি হচ্ছে তার বাহন। কংগ্রেসের আহ্বানে প্রতি হৃদয় থেকে ধ্বনি উঠেছে—“ভারতবর্ষ ছেড়ে যাও”। হৃদয়ের সেই স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনি রোধ করার জন্য সরকারী শাসন জাতির কণ্ঠ চেপে ধরছে।

আর পরিমল! উদাসীন দ্রষ্টার মতো সে দেখছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য গণযুদ্ধ চলছে; তার লুব্ধ যৌবন এর মাঝে ঝাঁপ দিতে চায়। সংসারের দারিদ্র্য তার পা চেপে ধরেছে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের গতি দেশের প্রান্ত পর্যন্ত এসে থেমেছে। সে শুনছে—এই যুদ্ধ বিশ্বের স্বাধীনতার যুদ্ধ, বিশ্বের সুখ-শান্তির যুদ্ধ। তার যৌবন চায় এতে অংশ নিতে—কিন্তু পরাধীন জাতির নিগড়বদ্ধ জীব সে; কি অধিকার তার আছে পোল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেওয়ার—যখন পরাধীনতার অভিশাপ বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য তার জাতির অদৃষ্টে লেখা রয়েছে! সে দেখছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারির করাল ছায়া দেশের উপর ঘনিয়ে আসছে। তার প্রমত্ত যৌবন চায় দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে। কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রের ঔদাসীন্যে খাদ্যদ্রব্যের অভাব, ঔষধ পথ্যের অভাব,

পরবার কাপড়-চোপড় ও নিত্যকার সব দ্রব্যের অভাব সেখানে তার ব্যর্থ সেবায় কি উপকার সাধিত হবে! সে দেখছে, তার চোখের সামনে তার মা-বাপ, ভাই-বোন দিনের পর দিন অনাহারে শুকিয়ে শুকিয়ে মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে; তার যৌবন চায় তাদের ক্ষুধায় অন্ন জুটিয়ে দিতে। কিন্তু ব্যর্থ যে তার সবই—সে যে পবাধীন জাতির লোক।

*　　*　　*　　*

১৩৪৯ সাল—পূজা ঘনিয়ে আসছে। পিতা দেশেই থাকতেন—জমিজমা দেখতেন ও সামান্য কাজ করতেন; গত দুবছর পর পর ঝড় ও বন্যায় তাদেব দেশেব বাড়ি ঘব, খেতখামাব সব ডুবে গিয়েছে। সাবা বৎসরের জীবিকা তাতে ধ্বংস হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে পিতাব স্বাস্থ্য। পরিমল তখন কলিকাতায় সামান্য চাকবি কবে। 'মুখ দিয়েছেন যিনি, খাবার দিবেন তিনি'—এই প্রবচনের উপর ভবসা ক'রে বাবা ও মা ছোট দুটি ভাই-বোন নিয়ে কলিকাতা এলেন। আজ তিন মাস হ'ল তাঁবা এসেছেন; কিন্তু কোন ব্যবস্থাই হতে পাচ্ছে না। আহাব নেই, ঔষধ নেই, পথ্য নেই,—এক পা এক পা ক'রে পিতা এগিয়ে যাচ্ছেন মৃত্যুর দিকে।

বিনযদা মাঝে মাঝে এসে মার হাতে দু'একটি টাকা দিয়ে যায়—নইলে অনেক পূর্বে অন্নাভাবের বাহনে চ'ড়ে মৃত্যু তার গৃহে প্রবেশ করত। সে দরিদ্র; কিন্তু তবুও বিনয়দাব সঙ্গে তার মতের অনৈক্য সে গোপন করে নি। তাই বিনয়দা তার হাতে টাকা দেয় না। বহুদিনের কথা—বিনয় তখন সদ্য

বন্দী-জাবন থেকে মুক্ত হয়ে এসেছে—এর কিছু পরেই তাব সঙ্গে পরিমলের পরিচয় হয়।

ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক সংগঠন, কংগ্রেস, সাম্যবাদ—অনেক কথা পরিমল শুনেছে এবং অনেক কাজে সে যোগ দিয়েছে। দারিদ্র্যের নিগড়ে সে আটকে পড়েছে সংসারের কীলকে কিন্তু তখনও ছাত্রজীবনের সব স্বপ্ন সে ভুলতে পাবে নি। আজ কংগ্রেসেব আহ্বানে দেশে যে উদ্বেলতা জেগেছে, পরিমলের সর্বান্তঃকরণের সহানুভূতি সে দিকে,—এখানেই বিনয়দাব সঙ্গে তার মতেব বিশেষ অনৈক্য। কয়মাস পূর্বে পারিবারিক প্রথম দুর্যোগের দিনে, বন্যাপ্লাবনে বিধ্বস্ত গ্রামের বাড়ির আর্থিক অভাবের প্রথমকার অবস্থায়—বিনয়দার সাহায্য সে প্রত্যখ্যান করেছিল; বলেছিল—"এ কলুষিত অর্থ আমি গ্রহণ করতে পাবি না।" বিনয়দা প্রতিবাদ করেছিল; কিন্তু ক্রুদ্ধ হয় নি, অপমান-বোধের রেখা তার মুখে-চোখে ফুটে ওঠে নি ·

এখন সে মার হাতে দু'একটি ক'রে টাকা দিয়ে যায়, পরিমল টের পায়;—কিন্তু দারিদ্র্য তার সব শক্তি শোষণ ক'রে নিচ্ছে—সে আর প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না।

* * * *

সেদিন কলিকাতার রাস্তায় গুলি চলেছে—দোষী নির্দোষী নির্বিচাবে। জনতার ধৃষ্ট অপরাধ—কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফতারের পর দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ সুরু হয়েছে তারাও তাতে একটু অংশ নিতে চাচ্ছিল—জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে তারাও তাদের করণীয় যা, তা করতে চাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে

তাদের খোলার গৃহে তার পিতার মৃত্যু হ'ল। নিজের মনেই সে জানে না—পিতার মৃত্যুর কারণ কি। তাই শ্মশানের খাতায় যখন মৃত্যুর কারণ লেখাতে হ'ল তখন সে একটু মুস্কিলেই পড়ল। ব্রিটিশ শাসনে অনাহারে যে কারুর মৃত্যু হ'তে পারে, তা ত সম্ভব নয়—তাই সে খাতায় তেমন কোন ঘরও নাই। কাজেই অন্য কোন ব্যাধিই লিখাতে হবে, তা সে যা-ই হ'ক, জ্বর, আমাশয়, পেটের অসুখ কি কলেরা—কিছু আসে যায় না। এর কোনটাই যে সত্য নয়! সত্যই মৃত্যুর কারণ কি? কিন্তু পরাধীন দেশে এত সত্যের মর্যাদা কেন! শাসকগণ ত এত সত্যনিষ্ঠা বরদাস্ত করবে না। সত্যের সন্ধানী আলো-কে প্রশ্রয় দিলে অনেক কুৎসিত ঘা অনাবৃত হবে।

সংসার তার আর যেন চলছে না; কিন্তু তবুও চলছে। বিনয়দার অর্থ মাঝে মাঝেই মার হাতে আসে; আর মা শতমুখে তার সুখ্যাতি করে। সে শুনেছে—দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে নারী-শিকারীর দল নারীর নারীত্বকে প্রলুব্ধ করে;—নারীর মর্যাদাকে পণ্য করার লোভের পথ অল্প অল্প ক'রে উন্মুক্ত ক'রে দেয়। তার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বিনয়দা তার মনুষ্যত্বকে প্রলুব্ধ করছে; একা বিনয়দা কেন—সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থাই ত এই ভাবে মানুষ শিকার ক'রে চলছে। বুভুক্ষু নরনারীর সামনে দু'এক মুঠো খুদ-কুঁড়ো রাষ্ট্র থেকে ছুড়ে দিচ্ছে; ক্ষুধার্ত মানুষ দলে দলে আসছে ঐ রাষ্ট্র-উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাবার জন্য। পার্থক্য কোথায়? রাষ্ট্রের সেবায় যে দলে দলে লোক যাচ্ছে, তার মধ্যে কয়জন সত্য সত্যই রাষ্ট্রের হিতার্থী! সবাই ত যাচ্ছে ঐ খুদ-কুঁড়োর আশায়।

সে দিন মা বলছিলেন—"পরিমল, এমনি ক'রে কয় দিন চলবে? কি চাকরি নাকি তোকে দিতে পারে, তুই রাজী হ'স না। সে ত তোর ভালর জন্যই বলছে আর সে-ও ত দেশের শত্রু নয়। এত বছর জেলে ত ছিল; এখনও সে স্বদেশী দলের একজন নেতা; কতবড় কাগজের একজন লেখক—সম্পাদক না কি;—কি যেন তোরা বলিস!..."

মা নাম বললেন না;—পরিমলও নাম জিজ্ঞাসা করল না। পরিমলের মা প্রায়ই এমনি কথা বলেন। "সেও ত দেশের শত্রু নয়—after all he is not an enemy of the country"—এই ত হ'ল সূক্ষ্ম রন্ধ্র, যা দিয়ে মৃদু অথচ ধীর ধারায় প্রবাহিত হয় কলুষিত রাজনীতির রজত-স্রোত। ইডেনের উদ্যানে শয়তান ইভকে প্রলোভিত করেছিল—এমনি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়ে। একেলিস নিহত হয়েছিলেন শরীরের এমনি একটি ক্ষুদ্র দুর্বল স্থান দিয়ে। যুধিষ্ঠিরের রথ মাটি স্পর্শ করেছিল এমনি একটি সূক্ষ্ম যুক্তির জালে প'ড়ে।

বিনয়দা তার চেয়ে শিক্ষিত, অভিজ্ঞ—দেশের জন্য তার চেয়ে বিনয়দার ত্যাগ বেশী, তিনি সংবাদপত্র-সেবী; বিশ্বের খবর রাখেন তিনি অনেক বেশী। তাঁর যুক্তির ধার না থাক, তার ভার আছে যথেষ্ট। তার উপর আছে—তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি, রাষ্ট্রের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা। কাজেই তাঁর যুক্তি যে মার কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীয়মান হবে, এ ত বিচিত্র নয়। কিন্তু সে ত জানে, যুক্তির সঙ্গে ধারের পরিবর্তে এই যে ভার, এর মূল্য কতটুকু! গতকালকার উগ্রপন্থী আজিকার দিনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি-কারী বিকৃতপন্থী এমন দৃষ্টান্ত ত দেশে ও বিদেশে বিরল নয়।

সে দিন তার এক সহপাঠিনী নীরু তার সঙ্গে দেখা করতে এল। ক্রমে এদের বাসায় তার আনাগোনা একটু ঘন হ'য়ে উঠল। একই সঙ্গে এরা ছাত্র-আন্দোলনে লিপ্ত ছিল। একদিন পরিমলের মনে একটু র'ঙ্গর ছোঁয়াচও লাগিয়েছিল এই মেয়েটির যৌবন। আজকাল এমনি একটু বর্ণচোরা প্রণয় স্পর্শ খুব বিরল নয়। কোন এক মুহূর্তের খেয়ালে যা আসে, অপর মুহূর্তের মর্জিতে তা ভেসে যায়। তবুও নীরুর হঠাৎ এই আগমনে পরিমলের দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট মন যেন একটা বিদ্যুৎস্পর্শ অনুভব করল। মার সঙ্গেও নীরুর পরিচয় হ'ল। একটি দরদী শ্রোত্রী পেয়ে মা তার সুখ-দুঃখের সব কথাই নীরুকে বললেন। মার দুঃখে নীরুর অন্তর কেঁদে উঠল; নীরু বলল—"পরিমলবাবু, কেন এমনি ক'রে সবাইকে শুকিয়ে মারছেন?"

পরিমল অপরাধীর সুরে বলল—"কি করব বলুন—দিন না একটা ভাল চাকরি জুটিয়ে।"

নীরু—"এক্ষুণই;—মাইনে ত পাবেন—তা ছাড়া ration পাবেন। Civic Guard-এ ভাল কাজ আপনাকে দিয়ে দেব। আমিও ত মেয়ে Civic Guard-এ আছি কি না। চলুন আমার সঙ্গে, আপনাকে Warden করিয়ে দেব। কিছু দিনের মধ্যেই আরও ভাল কাজ পাবেন।"

পরিমল চুপ ক'রে রইল। নীরু বলল—"কি, কথা বলছেন না যে? আপত্তি আছে আপনার?"

পরিমল সংক্ষেপে তার কথা বলল নীরু জবাব দিল—Take it as a mere service—নিছক চাকরি হিসাবেই

নিন না। সাহেবের সওদাগরী আফিসেও ত লোক চাকরি নিচ্ছে। তার চেয়ে ত এ খারাপ নয়; অন্ততঃ বিপদের সময় দেশের লোকদের সাহায্য করার সুযোগ ত পাবেন।"

পরিমল—কিন্তু নিছক চাকরি হিসাবে যে যাবে তাকেই ত ওরা নেবে না। এই চাকরি নেওয়ার যোগ্যতা যে আমার আছে তা ত দেখাতে হবে।..."

নীরু—"সে দায়িত্ব আমার, আর বিনয়বাবুর।"

এর পর নীরু মাঝে মাঝে আসে; পরিমলের সঙ্গেও দীর্ঘ ও ঘনিষ্ঠ আলাপ করে। মার কাছে ব'সে তাঁর সুখ-দুঃখের কথা শোনে। ছোট ভাই-বোনের সঙ্গে আলাপ করে।

তারপর একদিন সে নীরুর কাছে পরাজয় মানল।...

Civic Guard-এর কাজ নিয়ে সে আর কলিকাতা থাকতে রাজী হ'ল না। সে নিজের জেলায়—Civic Guard-এর সংগঠক হিসাবে চ'লে গেল।...

* * * *

নন্দীপুর গ্রামে ডাকঘর পুড়িয়ে দিয়েছে; টেলিগ্রামের তার কেটে দেওয়া হয়েছে, রেল লাইন নষ্ট করা হয়েছে। সরকার তার প্রতিবিধান করছে। একদল সিভিক গার্ড নিয়ে পরিমল এসেছে এই গ্রামে। গ্রামের লোকদের সে আহ্বান করেছে—এখন থেকে তাদেরই রেল লাইন পাহারা দিতে হবে। সরকার থেকে গ্রামের উপর শাস্তিমূলক জরিমানা ধার্য করেছে। সভায় সমবেত কৃষক-শ্রেণীর পশ্চাতে ছিল জনকয়েক শিক্ষিত যুবক। পরিমল বলছে—"যারা এই সব ধ্বংসমূলক কাজ করছে—তারা দেশের শত্রু—

জাপানের গুপ্তচর।" পিছন থেকে একটি যুবক বলল—"আর যারা ইংরেজের চর হ'য়ে দরিদ্র কৃষকদের ঘর থেকে জরিমানা আদায় করছে, তারা হ'ল দেশের মিত্র।..." সভায় গোলমাল সুরু হ'ল ; এই গোলমালে সভা ভেঙ্গে গেল।

গ্রামের একদল লোককে সিভিক গার্ডে ভর্তি করা হ'ল। রাত্রে তারা রেল লাইন পাহারা দিচ্ছিল ; সঙ্গে কয়েকজন পুলিশও ছিল। শীতের অন্ধকার রাত। কুয়াসায় ও অন্ধকারে রাত্রির আবরণ ঘন হয়েছে। পাশের গ্রামের ফ্যাসী-বিরোধী সংঘের নেতা পরিমলকে খবর দিয়েছে—একদল লোক রেল লাইন ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। তাই কয়দিন যাবৎ খুব জোর পাহারা চলছে। কয়েকটী দরিদ্র কৃষক-শ্রেণীর লোক রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাচ্ছিল। গ্রাম-জননীর ক্রোড়ে আর তাদের স্থান হচ্ছে না ; ঘরে অন্ন নেই ; বাজারে বা গ্রামে ভিক্ষা মিলে না ;—তার উপর সরকারী জরিমানা ও শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার যে বহর চলেছে, তাতে গ্রাম ত্যাগ করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। গ্রামে উপার্জনের সব পথই রুদ্ধ ; নৌকা, গাড়ী প্রভৃতি যান-বাহন সরকার নিয়ে গিয়েছে। তাঁতী, কামার, কুমোর, কাঁসারী সবাই আজ বৃত্তিহীন বেকার। যদি শহরে গিয়ে কিছু উপার্জন করতে পারে এই উদ্দেশ্যে তারা চ'লে য'াচ্ছিল।

অল্পদূরে পরিমলের দল দেখল কয়েকজন লোক যেন আসছে। জাপানী গুপ্তচরের দল আসছে!—দেখেই রক্ত তাদের উষ্ণ হ'য়ে উঠল।

*   *   *   *

নিরীহের উষ্ণ রক্তধারায় শীতল মৃত্তিকা উষ্ণ হ'য়ে উঠল।

*　　　*　　　*　　　*

দু'দিন পর পরিমল খবর পেল, দুই মাইল দূরের রেল লাইন এক মাইল পর্যন্ত কে উঠিয়ে ফেলেছে।

চলল অপরাধীর অন্বেষণ। গ্রামের সুস্থ যুবক, দুর্বল বৃদ্ধ, শিশু ও নারী—কেউ বাদ গেল না। গভীর রাত্রে এক গৃহের পর অপর গৃহে অন্বেষণ চলল। পৌষের রাত; শীতে মানুষ ও প্রকৃতি সবই যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে। পুকুরের শান্ত শীতল জল চঞ্চল হ'ল মানুষের অনিচ্ছাকৃত অবগাহনে;—সিক্ত বসন, সিক্ত কেশ, সিক্ত দেহ নিয়ে লাইনবদ্ধ হ'য়ে সবাই দাঁড়িয়ে রইল। প্রভাতে তাদের সনাক্ত হবে। জনযুদ্ধের রথ চলছে—নারীর ইজ্জৎ, মানুষের মনুষ্যত্ব···এ সব তার কাছে তুচ্ছ।

গৃহে ফিরে এল পরিমল। আজ কয় মাসের কথা—সিনেমার ছবির মতো একে একে সব তার মনে পড়তে লাগল। মনে পড়ল—যুক্তির সেই সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথ—এরা-ও ত দেশের ভাল চায়, এরা-ও ত দেশের শত্রু নয়—after all he is not an enemy of the country···না, না, অতীতের দিকে সে তাকাবে না···মুছে যাক ঘুচে যাক সে সব কথা। ভবিষ্যৎকে নিয়েই তার জীবন। সত্যই ত ত্যাগে যাদের জীবন মহিমান্বিত হয়েছে, বিদ্যায়, অভিজ্ঞতায় যারা তার চেয়ে অনেক শ্রেয়, যারা সত্যই তার হিতাকাঙ্ক্ষী—তারা কি তাকে অন্যায়ের পথে চালিত করবে! বিনয়দা তাকে সত্যই স্নেহ করেন; নিরু···হ্যাঁ নীরু—ছাত্রজীবনের সেই বান্ধবতা আবার সে পুনর্জীবিত করতে এল কেন? পরিমলের দুঃখে তার

এত দরদ, এত ঘনিষ্ঠতা···এর কি কোনই মূল্য নেই! হঠাৎ মাথায় একটা ঝাঁকুনি বোধ ক'রে পরিমল অনেক ছোট খাটো কথা স্মরণ করল। কখন নীরু তার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিল—দেহের সান্নিধ্য, বসনের সৌরভ, কেশাগ্রের স্পর্শ··· আরও এমনি কত!······যেদিন সে চাকরি গ্রহণের সম্মতি দিল, সেদিনের কথা ত আর ভুলবার নয়। কি সম্বর্ধনা নীরু তাকে দিয়েছিল।···

কয় মাস চ'লে গেছে। দুর্ভিক্ষের করাল মূর্তি বাংলার বক্ষে বিচরণ করছে। কীট-পতঙ্গের মতো লোক মরছে। কিন্তু পরিমলের অনেক পদোন্নতি হয়েছে। সে এখন সরকারী দপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী। আজ আর তার অর্থের অভাব নেই।

খাদ্যের পুঁজি-বিরোধী অভিযান নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। দলবল নিয়ে সে গৃহে গৃহে চাউলের সন্ধান করছে; আর চাউল জমা হচ্ছে সরকারী গুদামে। অনাহারে মানুষ মরছে; তবুও সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী এটা হ'ল উদ্বৃত্ত অঞ্চল; এখান থেকে চাউল সংগ্রহ ক'রে অন্যত্র চালান দিতে হবে।

সেদিন দুপুরে পরিমল খেতে বসেছে, মা পাশে ব'সে আছেন। মা বললেন—"পরিমল, এ কি করছিস? এমনি করে দেশশুদ্ধ মানুষের শাপমন্যি কুড়াচ্ছিস। এ ত' আর সহ্য হয় না, বাবা।···"

পরিমল "মা, এটা মহাযুদ্ধের সময়। কত দেশে কত লোক মরছে,—কে তার হিসাব রাখছে! চোখের সামনে দু'চারটা লোকের মৃত্যু দেখে এত বিচলিত হ'লে চলবে কেন?"

মা—"কোথায় কে মরছে জানি না, বাবা। তারা হয়ত যুদ্ধ ক'রে মরছে। তাদের একটা সান্ত্বনা আছে। যুদ্ধে মরবার সদ্‌গতি তাদের হবে; তাদের বাড়ীর লোকজন ত উপোস করেও থাকছে না। সরকার থেকে তাদের ব্যবস্থাও করছে। তার পর—তারা জেনে বুঝে যুদ্ধে গিয়েছে;—মারবেও মরবেও।···কিন্তু এরা মরছে কেন? না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে গুষ্টিশুদ্ধ সবাই মিলে মরছে; মরবার আগে কুকুর-বিড়ালের মতো উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে খাচ্ছে। মা-বাপ ছেলে-মেয়ে বিক্রি করছে, ছেলে-মেয়েরা মা-বাপ ফেলে চ'লে যাচ্ছে। গ্রামে কত মেয়ে এমনি ক'রে কোন্ পাপের রাজ্যে চ'লে গিয়েছে, তা জানিস? দিন-রাত একমুঠো ভাতের জন্য কি হাহাকার চলছে! এর-ই মধ্যে তুই চাউল কেড়ে নিয়ে কোথায় চালান দিচ্ছিস!"

পরিমল—"যুদ্ধের দিনে এ সব হবে-ই। যুদ্ধের প্রয়োজনের কাছে ত অন্য কারুর দাবী টিকতে পারে না। এ সব তুমি বুঝবে না, মা। এদের বাঁচবার কোন যোগ্যতা নেই, তাই এরা মরছে।··· "

মা—"পরিমল, তোর হ'ল কি? এক বছরে তোর এতটা পরিবর্তন?"

পরিমল—"তুমি ত তা-ই চেয়েছিলে; আজ আমায় দোষ দিচ্ছ কেন মা?"

মা—"মা হ'য়ে ছেলের এমনি মতি-গতি আমি চেয়েছিলাম! হা ভগবান!"

মা উঠে চ'লে গেলেন।

পরিমল সেদিন গৃহে ছিল না। মা ও ছোট ভাই-বোন মিলে কয়েকটি ক্ষুধার্তকে নিজেদের খাবার থেকে কিছু ভাত, কিছু মুড়ি ও কিছু ভাতের ফেন দিয়েছে। তাই নিয়ে ওদের মধ্যে কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেছে। ক্ষুধার্ত মা ও তার চারপাঁচটি ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে খাচ্ছে। কয়দিন পর তারা খাবার পেয়েছে। সন্তানদের ঠেকিয়ে রেখে মা খেতে চেষ্টা করছে। একটা ছেলে মার মুখের গ্রাস থাবা দিয়ে নিজের মুখে পুরে দিল। এমনি সময় পরিমল এসে তাদের পিছনে দাঁড়িয়েছে। মা ছেলেটাকে ঠেলে ফেলে দিল। একটা বিশ্রী চেঁচামেচির মধ্যে মা হঠাৎ যেন নিজের মাতৃত্ব ফিরে পেল; সে হাত গুটিয়ে ব'সে রইল। পরিমল পিছন থেকে একটা ধমক দিয়ে উঠল—"বেরো সব। যত সব কুকুরের দল।" তখনও মাটির পাত্রে কিছু খাবার প'ড়ে ছিল। পরিমল ক্ষিপ্তের মতো তাদের কাছে গিয়ে লাঠির ঠেলায় পাত্রটি উবুড় ক'রে ঠেলে ফেলে দিল।

ভিখারিণী মা কেঁদে উঠল—"কি করলে বাবু! ফেলে দিলে! কয়দিন পর ওরা খাবার পেয়েছিল!......" সে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেলল।

পরিমলের মা বললেন—"একি করলি পরিমল!" এদিকে ঐ ভিখারী ছেলে-মেয়েগুলি মাটি থেকে ভাত, মুড়ি, ফেন খুঁটে খুঁটে চেটে চেটে খেতে লাগল। মার তিরস্কার, ভিখারিণীর কান্না, ঐ ছেলে-মেয়েগুলির ঐ কুকুরবৃত্তি—সব মিলে পরিমলকে আরও ক্ষিপ্ত ক'রে তুলল। হাতের ছড়ি চালিয়ে সে ওদের বের ক'রে দিল। একটা ছেলের পিঠে তার ছড়ির আঘাতের দাগ ব'সে গেল।

সন্তানদের টেনে নিয়ে ভিখারিণী বের হয়ে যেতে যেতে বলল "...মেরো না বাবু, মেরো না। মরে যাবে...আমরা—যাচ্ছি......।" সবাইকে নিয়ে সে চলে গেল।

পরিমলের মা চুপ ক'রে ব'সে রইলেন; একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বের হ'ল না। পরিমল আর ওখানে দাঁড়াল না। কিছুক্ষণ পরে মা যখন উঠে গেলেন তখন তাঁর দুচোখের কোণে অশ্রুবিন্দু জমে ছিল।

সেদিন আর মা কিছু খেলেন না। পরিমলের ছোট বোন পিরু অনেক ক'রে বলল, কিন্তু মা বেশী কথায় গেলেন না। মুখ গুঁজে বিছানায় শুয়ে রইলেন। পরদিনও যখন মা উঠলেন না, তখন পিরু বলল—"তবে দাদাকে ডেকে আনছি মা।" মা চমকে পিরুর হাত চেপে ধ'রে বললেন—"না পিরু, তার দরকার নেই,...আমি উঠছি।......পিরু, আমার বুক ভেঙে গেছে, মা। আর কোথাও আমার ঠাঁই নেই, অথচ এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছা হয় না—যেন শ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে।"

মা মুখে কাপড় দিয়ে কান্না চেপে রাখছেন। তাঁর সমস্ত শরীর রুদ্ধ কান্নার বেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। পিরু বলল—"মা, দাদার এমন হ'ল কেন? কি ছিলেন, আর আজ কি হয়েছেন?"

মা—"আমারই পাপের ফল মা, বেশী খেতে লোভ হয়েছিল। তার যে এমনি ফল ফলবে, তা কি জানতাম। কি যে হ'ল, আরও যে কি হবে বুঝি না। এখন মরণ হ'লে বাঁচি।....."

দু'দিন পরে মা পরিমলের ছোট ভাই অমলকে বললেন—"অমু, দেখিস ত বাবা, সেই ভিখারিণীটা আর তার ছেলে-মেয়েগুলোর দেখা পাস কি না। দিনরাতই মনটা খুঁতখুঁত করছে।......"

অমল বলল—"তাদের কি দেখা পাব মা! কোথা থেকে কোথায় চ'লে গেছে, তার কি কিছু ঠিক আছে!......কত লোক মরছে মা,......রাস্তায় বেরুতে ইচ্ছা হয় না।...... চল মা, এখান থেকে চ'লে যাই। ঈস্...কি বলব মা। দিনের বেলা রাস্তার পাশে শিয়ালে মরা মানুষ টেনে খাচ্ছে।......" বালকের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল। মা তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। কোন সান্ত্বনা-বাক্য তাঁর মুখ দিয়ে বের হ'ল না।

*　　*　　*　　*

সেদিন মা কাজ করছিলেন; অমল এসে তাঁর পাশে বসল; সে একটু অস্বাভাবিক রকম চুপ ক'রে আছে। কাজের মধ্যেও তার এই শান্তভাব মার দৃষ্টি এড়াল না। মা বললেন—"কি অমু, কি হয়েছে রে?"

অমল—"মা, আজ ঐ ভিখারিণীর দেখা পেয়েছিলাম।..." আর সে বলতে পারল না।

মা-ও যেন আর প্রশ্ন করতে সাহস করছেন না। কিন্তু জানবার আগ্রহও চেপে রাখতে না পেরে, মা জিজ্ঞাসা করলেন—

"কেমন দেখলি রে, অমু?"

অমল—'পাগল হ'য়ে গেছে, মা।"

মা—“পাগল হ’য়ে গেছে ? বলিস কি রে! ছেলে-মেয়েগুলোর খবর কি ?

অমল—“সব মরে গেছে মা, কেবল একটা ছেলে আছে। সব মরা ছেলে-মেয়েগুলোকে জড়িয়ে বসে আছে।···শিয়ালে কোন কোনটার শরীরের কিছুটা খেয়েছে।···আমার সামনে একটা শিয়াল এসে ওর কোলের কাছ থেকে একটা ছেলেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। পাগলী খিল্ খিল্ ক’রে হাসছিল··· আর বলছিল···‘খা, খা, কচি মাংস···বেশ ভাল লাগবে······ আমিও খাব···।—খুব ক্ষুধা পেয়েছে কি না ; কচি মাংস আমার নিজের শরীর দিয়েই ত ঐ মাংস তৈরি হয়েছে··· খুব ভাল লাগবে।······তারপর মা, একটা ছেলের গায়······”

মা চীৎকার ক’রে উঠলেন—“থাম্ অমু, হতভাগা, আর বলিস না···” বলেই মা অজ্ঞান হ’য়ে পড়লেন।

* * * *

তিনচার দিন পরের কথা। আবার পূজা আস্‌ছে। এক বছর পুর্বে এমনি সময় তিনি স্বামীকে হারান। আজ বার বার সেদিনের কথা মনে পড়ছে। আজ একান্ত ভাবেই পুত্রের উপর তাকে নির্ভর করতে হচ্ছে। আজ যদি তাঁর স্বামী বেঁচে থাকতেন তবে ত এমন ভাবে পুত্রের মুখাপেক্ষী হ’য়ে থাকতে হ’ত না! আজ শৃঙ্খলিত হ’য়ে, পুত্রের গলগ্রহ হ’য়ে তিনি এখানে আছেন।······

অল্পদূরে বহু কণ্ঠের করুণ ক্রন্দনধ্বনি উঠছে, মার চিন্তা-ধারা ছিন্ন হ’য়ে গেল—সেই ক্রন্দনের তরঙ্গাঘাতে। কান পেতে শুনছিলেন। অমল দৌড়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকল।

মাকে দেখেই সে বলল—"মা, মেরে ফেলল, মেরে ফেলল,—উঃ—কি মার মারছে মা।"

মা—"কে মারছে, কাকে মারছে! কেন রে?"

অমল—"ঐ সরকারী চাউলের গুদামের সামনে একদল লোক কাল থেকে ভীড় ক'রে ব'সে আছে—তারা চাউল চায়! কার কাছে শুনেছে—আজ এখান থেকে চাউল কোথায় চালান হবে। তারা বলছে—'আমরা না-খেয়ে মরছি, আর তোমরা চাউল চালান দিচ্ছ, লড়াইতে, না কোথায়—তা হবে না। আমাদের চাউল চাই।……' তারপর দাদা পুলিশে খবর দিয়েছেন। পুলিশ, সিভিক গার্ড আরও সব অনেকে মিলে ওদের লাঠি দিয়ে মারছে।…কারুর হাত ভাঙ্গছে, কারুর মাথা ভাঙ্গছে, চীৎকার করে সবাই ছুটছে।…মার খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন ও'পাড়ার সুবোধ বাবু;—হাতে তাঁর কংগ্রেসের নিশান।……"

মা—"পরিমল কি করছে?"

অমল—"সেই-ই ত হুকুম দিয়েছে; আর লোকদের বলছে—কোথায় সেই জাপানী গুপ্তচর, কংগ্রেসের পাণ্ডারা আজ কোথায়? তোদের পরামর্শ দিয়ে সেই বেটারা কোথায় পালিয়েছে?—দাদা আর পুলিশের দারোগাই ত সব হুকুম দিচ্ছে।"

শুনতে শুনতে মা অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন। এমনি আজ কাল মাঝেমাঝেই হয়।

* * * *

ভোর বেলা দরজা খুলতেই একটা দুর্গন্ধ মার নাকে এল।

তাকিয়ে দেখেন, প্রাঙ্গণের চার কোণে চারটি কঙ্কাল—এখনও কিছু গলিত মাংস সেই সব কঙ্কালের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। চারটিই শিশুর কঙ্কাল; প্রাঙ্গণের মাঝখানে এক মৃত নারীদেহ পড়ে আছে।

মা আর এক পাও এগুতে পারলেন না। থর্‌থর ক'রে তাঁর দেহ কাঁপতে লাগল। তিনি জোরে চীৎকার ক'রে ডাকতে চেষ্টা করলেন—পিরু, পিরু! কিন্তু আওয়াজ কণ্ঠ থেকে বের হচ্ছে না। প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করলেন; অস্ফুট শব্দ বের হ'ল—পিরু! সঙ্গে সঙ্গে তার কম্পমান দেহ অসাড় হ'য়ে ধরণীর শীতল বক্ষে লুটিয়ে পড়ল।

পিরু ও অমল দৌড়ে এসে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রভাত আলোর আভায় তারা দেখল সেই ভিখারিণীর মৃত দেহ আর তাদের মার মৃতদেহ পাশাপাশি প'ড়ে আছে।

ব্যথার বাঁশী

রাজা তাঁর সভাসদ নিয়ে রাজসভায় বসে আছেন। অর্থী-প্রার্থী, সভাসদ, বিদূষক, রাজকবি, মন্ত্রী, সেনাপতি— সকলেই সভার শোভাবর্ধন করছেন। এমন সময় দ্বারপাল একটি যুবককে রাজসভায় নিয়ে এল! যুবকের সৌম্য, শান্ত, সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠবের উপর একটা করুণ বিষাদের ছায়া পড়েছে। উন্নত ললাটে কে যেন একটা দুঃখের তিলক পরিয়ে দিয়েছে, তার স্বভাব-উজ্জ্বল বদনমণ্ডল একটা বিষাদের কালো ছায়ায় আবৃত হয়েছে। বুদ্ধির প্রাখর্যে চঞ্চল চোখ যেন করুণ কালিমায় মন্থর হয়ে আছে।

মহারাজের সিংহাসনের সামনে উন্নতমস্তক যুবক যখন নতশিরে এসে দাঁড়াল, তখন মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন— "কি চাই তোমার, যুবক?"

যুবক ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল,—"আমি মহারাজের কাছে আশ্রয়প্রার্থী।"

রাজা—"যুবক, তুমি বলিষ্ঠ, শক্তিমান ও বুদ্ধিমান। বিশ্বে তোমার আশ্রয়ের এমন অভাব হ'ল কেন?"

যুবক নতমস্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা—"বেশ, আশ্রয় তোমাকে দেব। কিন্তু তুমি যুবক, দায়িত্বহীন আলস্যে তোমার দিন কাটাবার সাহায্য আমি করতে পারি না। তোমার শরীরে বল আছে, মনে বুদ্ধি

আছে—তোমার যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী কোন কাজ তুমি বেছে নাও, তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক তুমি পাবে।”

যুবকের করুণ মূর্তি যেন আরও করুণ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে সে মুখ তুলে বললো—“মহারাজ, বড় আশা ক’রে আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরতে হ’ল। কোন কাজের যোগ্যতা আমার নেই ব’লেই আপনার কাছে এসেছিলাম। শুনেছিলাম, আপনি মানুষের মর্মকথা বুঝে বিচার করেন—মানুষের কর্মধারার উপর আপনার বিচার নির্ভর করে না। তাই ভেবেছিলাম হয়তো আপনি আমার অলস, অযোগ্য, অপটু জীবনভার রাখবার মতো একটু স্থান দেবেন।”

রাজা—“যুবক, তোমার কথা শুনে আমি বিস্মিত হচ্ছি। তুমি বলছ কোন কাজের যোগ্যতা তোমার নেই। তোমার এই বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ কোন কাজেরই যোগ্য নয়! তোমার মনের উজ্জ্বল ও প্রখর বুদ্ধি তোমার চোখে-মুখে ফুটে উঠছে। তুমি কি বলতে চাও কোন কাজের কোন পটুতা তোমার নেই? অবিচ্ছিন্ন আলস্যেই কি তোমার দিন কেটেছে?”

যুবক—“মহারাজ, কোন কাজেরই যোগ্যতা আমার দেহের বা মনের নেই। তাই তো আমি আপনার দ্বারে এসেছি। শুনেছি মানুষকে আপনি মানুষ হিসাবে দেখতে চান। এখন দেখছি মানুষের কোন মূল্য আপনার কাছেও নেই। অন্য সবার মতো আপনিও কি স্তূপীকৃত কাজের জঞ্জালের দাম দেবেন বেশী?—মানুষকে ছোট ক’রে তার বাহ্য সঞ্চয় ও সজ্জাকেই বড় ক’রে দেখবেন? তবে অনুমতি দিন, মহারাজ,

আমার এই অযোগ্য অলস জীবন নিয়ে অন্য কোথাও আশ্রয়ের চেষ্টা দেখি।"

রাজা—"না, যুবক, অন্যত্র তোমাকে যেতে হবে না। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক—কোন কাজের দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে না। আমার ঐ উদ্যানের পাশের ছোট কক্ষটি তোমার বাসের জন্য নির্দিষ্ট হ'ল। তোমার সব প্রয়োজনীয় বস্তুই তুমি রাজভাণ্ডার থেকে পাবে।"

যুবক রাজাকে অভিবাদন ক'রে বলল—"মহারাজ, আপনার জয় হোক্।"

মহারাজ—"কিন্তু যুবক, তোমার কোন পরিচয় তো দিলে না! কি তোমার নাম, কোথায় তোমার ধাম, কি তোমার বংশ—কিছুই তো বললে না।"

যুবক—"আমার তো কোনই পরিচয় নেই, মহারাজ। নাম আমাকে লোকে তাদের খুশীমতো দিয়ে নেয়—এখানেও আপনারা একটা দিয়ে নেবেন এ ছাড়া আর কোন পরিচয়ই আমার নেই।"

রাজা একটু হেসে বললেন, "এ কি কখনও হয়! নাম ধাম, বংশ সবারই একটা থাকে—তোমারও একটা থাকবেই।"

যুবক—"মহারাজ, আপনি যখন বলছেন সবারই থাকে, তখন হয়তো আমারও ছিল—কিন্তু আমি কিছুই জানি না। অতীতের দিকে যতদূর আমার দৃষ্টি যায়, তাতে আমি দেখি—এমনি পরিচয়হীন, নাম-ধাম-গোত্রহীন ভাবেই আমি বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোথাও আমার এতটুকু দাবী নেই, কোথাও আমার কোন স্থান নেই। কেউ আমাকে

বাতুল বলে, কেউ বলে ঋষি—তারা কেউ মনে করে আমি তাদের সমস্ত অমঙ্গলের মূল, আবার কেউ আদর ক'রে হু'একটা ভাল কথাও বলে, ভাল নামও দেয়। আমার নামের জন্য ভাবতে হবে না, মহারাজ। আপনার প্রজারাই আমাকে নাম দিয়ে দেবে। এত নাম আমি প্রতি স্থানে পেয়েছি যে, তা থেকে হু'চারটা ক'রে অপরকে দান করলেও আমার তবু প্রচুর থেকে যায়।"

মহারাজ বললেন, "তাই হোক, তোমার নাম তুমিই অর্জন ক'রে নাও।"

যুবক—"তাই ভাল মহারাজ। মানুষ—সে মানুষ; অপর পরিচয়ের কি প্রয়োজন! ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য একটা কিছু ব'লে ডাকতে হবে, তা যা হয় একটা কিছু ডাকবেন—আমার কোন বিশেষ নামের প্রতি কোন বিশেষ অনুরাগ বা বিরাগ নেই। আমি যে-মানুষ আছি, তা-ই থাকব, যে নামেই আমায় ডাকুন না কেন।"

মহারাজের আদেশে দ্বারপাল তাকে নিয়ে চলল। মহারাজের উদ্যানের কোণের ছোট ঘরটিতে সে থাকবে, রাজ-অতিথিশালা থেকে তার খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করবার আদেশও মহারাজ দিয়ে দিলেন। রাজাকে অভিবাদন ক'রে যুবক চলে গেল। যতক্ষণ তাকে দেখা গেল ততক্ষণ মহারাজ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সে যখন দৃষ্টির বাইরে গেল, তখন কতকটা আপন মনেই মহারাজ বললেন—"অদ্ভুত এই যুবক!"

সভাসদদের মধ্যে একজন বলল, "রীতিমত পাগল, মহারাজ।"

রাজা—"এই বুঝি সব নামকরণ শুরু হ'ল !"

দু'চার দিন যেতেই রাজার রাজ্যের নানা অঞ্চল থেকে সংবাদ আসতে লাগল, রাজ্যে যেন একটা বিষাদের ছায়া এসে পড়ছে, সমস্ত আকাশ-বাতাস যেন অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাসে ভাবাক্রান্ত হচ্ছে। গভীর রজনীতে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন, তখন তাদের গৃহের অর্গলবদ্ধ দ্বার ভেদ ক'রে, তাদের নিদ্রার আবরণ উন্মোচিত ক'রে, বক্ষের আগড় সরিয়ে বিষাদের এক জমাটবাঁধা মূর্তি তাদের অন্তরে প্রবেশ করে। সুরের রূপে হাওয়ায় ভেসে এসে সেই ঘনীভূত বিষাদ তাদের রাতের নিদ্রা, দিনেব শান্তি, দেহের বল, মনেব শক্তি সব কিছু হরণ করে। লোকে কাজকর্ম ভুলে এক অজ্ঞাত দুঃখেব ভারে মুহ্যমান হয়ে আছে। আলিঙ্গনবদ্ধ প্রণয়িযুগলেব আলিঙ্গন কোন্ এক অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় শিথিল হ'য়ে যায়; চুম্বনমুখী উষ্ণ ওষ্ঠ কোন্ এক অজানা ভয়ে হিমশীতল হ'য়ে ফিরে আসে। সন্তানপালনরতা জননী কোন্ এক অনাগত অমঙ্গলের আশঙ্কায় শিউরে ওঠে; মাতৃস্তন্যপানরত শিশু কোন্ এক অজ্ঞাত ভয়ে কেঁদে ওঠে। বিশ্রম্ভালাপী বন্ধুবা সহসা যেন অন্তবে একটা আলোড়ন অনুভব ক'রে প্রিয়-সাহচর্যের রসভোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অপত্যগর্বিত পিতৃহৃদয় যেন কোন্ অশুভ গ্রহেব ক্রূর দৃষ্টি কল্পনা ক'রে কম্পিত হয়। সুস্থদেহ ও সবলমনা যুবক যেন কোন্ দূর ভবিষ্যতের জরা-বার্ধক্যের দুর্ভাবনায় মুষড়ে পড়ে।

সমস্ত রাজ্যময় যেন একটা বিমর্ষ ত্রাসের ছোঁয়াচ লাগে। কেউ কাঁদে, কেউ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কারুর বুক থেকে থেকে

আতঙ্কে কেঁপে ওঠে, কেউ হতোদ্যম হ'য়ে ব'সে পড়ে, কেউ কাজকর্ম ছেড়ে বিলাপ করে। এমনি ক'রে রাজ্যময় একটা বিষাদের ঘনছায়া ছড়িয়ে পড়ল। রাজ্যের সেই শ্রী আর নেই। লোকের হৃদয়ে আশা নেই, মনে বল নেই, প্রাণে উদ্যম নেই, অন্তরে শান্তি নেই, দেহে শক্তি নেই, আঁখিতে নিদ্রা নেই।

সবাই শোনে রাত্রিতে একটা বিষাদের সুর কোথা থেকে ভেসে এসে সবার মনের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ে; তারপব আস্তে আস্তে তাদের সমস্ত দিনরাত্রি, দেহমনকে আচ্ছন্ন কবে।

গভীর রজনীতে সেই বিষাদ-মাখা বাঁশীর সুরে মহারাজেব নিদ্রা ভেঙে যায়। কে এই বাঁশী বাজায়? কোথা থেকে এই সুব ভেসে আসে? মহারাজ অনুভব করছেন কে যেন তাঁর বুকের ভিতর কান্নাব নির্ঝর খুলে দেয়। একদিন তিনি স্থির করলেন, এর খোঁজ করতেই হবে। কেউ কেউ তাঁকে ইতিমধ্যেই সেই অপরিচিত যুবকের যাদু-ক্ষমতার কথা বলেছে। নাম নেই, ধাম নেই, পরিচয় নেই—এমনি একটি লোককে আশ্রয় দেবার পব থেকেই রাজ্যময় এসব কাণ্ড শুরু হয়েছে। মহারাজের নিজেরও যে একটু সন্দেহ না হ'ত তা নয়। কিন্তু সেই প্রমাণহীন সন্দেহকে তিনি মনের মধ্যে স্থান দিতে চাইতেন না।

পরদিন অন্যের অজ্ঞাতে তিনি সন্ধ্যার পূর্বে একটি বিশ্বস্ত অনুচরসহ সেই উদ্যানে গেলেন—রাত্রিটা সেখানেই কাটাবেন। তিনি তাঁর অনুচরকে দিয়ে সেই যুবকের গৃহের প্রতি নজর

রাখলেন। গভীর রজনীতে যুবক ঘর থেকে বেরুল। অনুচরসহ রাজাও কিছু দূরে থেকে তার অনুসরণ করলেন।

যেতে যেতে নগরপ্রান্তে এক নিবিড় অরণ্যে তারা প্রবেশ কবল। দূর থেকে রাজা দেখলেন, একটি বৃক্ষের নীচে ব'সে সেই যুবক বস্ত্রের ভিতর থেকে তার বাঁশী বের করল। তারপর শুরু হ'ল নিস্তব্ধ বজনীর বক্ষ ভেদ ক'রে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে বিষাদেব বন্যা। যেন সেই যুবকের বক্ষে কান্নার এক অতল নির্ঝর জমে আছে, আর তা প্লাবনেব বেগে বাঁশীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

চন্দ্রালোকিত বৃক্ষপল্লবকে দোলায়িত ক'রে সেই কান্নার বেগ যেন চন্দ্রের বক্ষে গিয়েও কান্নার ঢেউ তুলছে। বেপথুমান তারকাবাজিও যেন বাঁশীর তালে তালে বুকের ভিতর বিষাদের স্পন্দন অনুভব করছে। বৃক্ষের শাখায় শাখায় নিষুপ্তি পক্ষীকুলও যেন সেই সুরের আবর্তনে চঞ্চল হ'য়ে উঠছে। সুখসুপ্ত বৃক্ষপত্রসমূহও যেন তাদের অন্তরের অশ্রুকে শিশিরকণায় পরিণত ক'রে বিন্দু বিন্দু ঝরিয়ে দিচ্ছে।

মহারাজ নিজের বক্ষেও সেই প্লাবনের ঢেউ অনুভব করছেন। দেহ ও মনের সমস্ত শক্তি যেন তাঁর লোপ পেয়ে গেল। কোন সুদূর অতীতেব পুরানো বিষাদ আবার নূতন ক'রে জেগে উঠলো; বর্তমানের তাঁর সমস্ত দুশ্চিন্তা ও দুঃখ যেন শতগুণ হ'য়ে দেখা দিল; অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভব অসম্ভব বহু শঙ্কা ও বিপদ, দুঃখ ও দৈন্য তাঁর মনের দুয়ারে ভিড় ক'রে দাঁড়াল। এই নিষ্করুণ বিষাদ তাঁর সমস্ত সত্তাকে নিষ্কাশন ক'রে অশ্রুর নিস্যন্দ বের করতে লাগল।

নিঃসহায় অবসাদে তাঁর অন্তর সেই নিষ্পেষণ সহ্য করতে লাগল।

তারপর কখন যেন বাঁশী থেমে গেল—কান্নার প্লাবন বন্ধ হ'ল।

যুবক চুপটি ক'রে তেমনি ব'সে আছে—যেন একটি প্রস্তরমূর্তি। তার সুগঠিত দেহ চন্দ্রালোকে স্নাত হচ্ছে—মাঝে মাঝে বৃক্ষ থেকে দু'একটি পুষ্প তার উপর ঝ'রে পড়ছে। যেন সেই বৃক্ষ কোন দেবতার পূজায় শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করছে। তার সেই ধ্যান-নিমগ্ন নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করতে রাজার একটু সঙ্কোচ লাগছিল। তাই একটু বিলম্ব ক'বে তিনি ধীরে ধীবে এগুতে লাগলেন,—অনুচরটিকে দূরে দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

আস্তে আস্তে সেই যুবকেব পশ্চাতে গিয়ে তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে তার স্কন্ধে হাত রাখলেন। তবুও যেন যুবকের ধ্যানভঙ্গ হয় না। তখন তিনি ডাকলেন, "নির্বেদী।" তাঁর স্নিগ্ধ আহ্বানে যুবক ফিবে তাকিয়ে বলল, "কে—ও! আপনি, মহারাজ! এই সময়ে আপনি কোথা থেকে এলেন! নিস্তব্ধ নিশীথে এই গভীর অরণ্যে আপনি কেন এসেছেন, মহারাজ?"

রাজা—"যুবক, এত কান্নার ফোয়ারা তোমার অন্তরে কি ক'রে এল? কে তুমি বল।"

যুবক—"মহারাজ, জানি না, জানি না কে আমি, জানি না এ কান্না কোথা থেকে আসে।"

একটু চুপ ক'রে রাজা আবার বললেন, "যুবক, তুমি জান

না কি ক্ষতি তুমি করছ—সবার অন্তরের শান্তি, মনের শক্তি, সব তুমি নষ্ট করছ। মানবের এত বড় শত্রুতা তুমি কেন করছ ?”

যুবক—“মহারাজ, সত্যই কি আমি মানবের ক্ষতি করছি ? তার অন্তরের সুপ্ত দুঃখকে জাগিয়ে দিয়ে কি আমি লোকের অনিষ্ট করছি ?”

রাজা—“মানবের অন্তরের সুখশান্তি নষ্ট করা যদি তার ক্ষতি করা না হয়, তবে কিসে তার ক্ষতি ও অনিষ্ট হবে জানি না। তুমি কি দেখছ না, কি অনিষ্ট তাদের করছ ?”

যুবক—“মহারাজ, ঠিক বুঝছি না। আমার মনে হয় বিশ্বের প্রতি অণুপরমাণুতে, বাতাসের প্রতি হিল্লোলে, জলের প্রতি কণায় কেবল জমাটবাঁধা দুঃখ। মহারাজ, প্রখর সূর্যতাপ যখন ধরণীর বক্ষে বর্ষিত হ’তে থাকে, তখন আপনারা তাতে কি দেখেন জানি না ; কিন্তু আমি দেখি সূর্যের বুকের রক্ত দুঃখের দাহনে উদ্বেলিত হ’য়ে তপ্ত রশ্মির আকারে ছুটে বেরোয়। চন্দ্রালোকে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হয়েছে—আমি এতে দেখছি, চন্দ্রের বিরহ-বিগলিত অশ্রু ঝ’রে পড়ছে। মহারাজ, মিটিমিটি করছে অসংখ্য তারকা—আমি দেখছি কোন নিরুদ্দেশ অজ্ঞাত যাত্রার পানে তীব্র বেগে ছুটে চলতে চলতে এদের বক্ষ ভয়ে, ত্রাসে কেঁপে উঠছে। আকাশের গায়ে ঐ যে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে – অশ্রুর ভারে ওদের অন্তর ভারাক্রান্ত। শোঁ শোঁ ক’রে বায়ু ছুটে চলেছে—শুনছেন না, মহারাজ, ওর করুণ দীর্ঘশ্বাস ? ঐ যে বনের ভিতর দিয়ে স্রোতস্বিনী বয়ে যাচ্ছে—তার বিষাদের গান গেয়ে গেয়ে সে চলেছে। এমনি বহু স্রোতস্বিনী যখন তাদের বিষাদের ভরা মহাসাগরের

বক্ষে পৌঁছিয়ে দেয়, তখন সাগরবক্ষ সেই কান্নার আবেগে গর্জে গর্জে ফুলে ওঠে—তার অন্তরের কান্নার অঞ্জলি তরঙ্গ হ'য়ে ফুটে বেরোয়। ঐ যে দূরে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে— পাহাড়ের বুকের ব্যথার আবেদন নিয়ে সে ছুটে বেরিয়েছে তার সৃষ্টিকর্তার পায়ে নিবেদন করবার জন্য। তারপর এল আপনাদের জীব-জগৎ। দুঃখে এদের জন্ম, দুঃখে এদের জীবন, দুঃখে এদের মৃত্যু। জন্ম-মুহূর্তেই শিশু কাঁদে—সে তো হাসে না। তারপর জীবনের প্রতি মুহূর্তেই সে কাঁদছে— কখনও দুঃখ-দৈন্যে, কখনও ভয়-ভাবনায়, কখনও বিরহ-বিচ্ছেদে, কখনও জরা-ব্যাধিতে—এমনি সব বিভিন্ন কারণে প্রতিনিয়তই মানুষ কাঁদছে। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা ক'রে মানুষ এরই মধ্যে নিজের দুঃখকে ভুলে থাকতে চায়। আমার বাঁশীর সুর যদি তাদের এই প্রবঞ্চনার আবরণ ভেদ ক'রে তাদের প্রকৃত স্বরূপ স্মরণ করিয়ে দেয়, যদি আমি তাদের ব'লে দিতে চাই— ভুলে যেও না তোমাদের সত্যিকার রূপ, তবে সে কি তাদের অনিষ্টসাধন করা হয়, মহারাজ ?”

যুবকের উচ্ছ্বসিত বাক্য শুনতে শুনতে রাজার কেমন একটা আবেশ ভাব এসেছিল। একটু পরে তিনি বললেন, “জানি না, যুবক, কি তুমি বলছ। কিন্তু তবুও আমার মনে হয়, যেন সবটাই তুমি বিকৃত ক'রে দেখছ।”

যুবক—“মহারাজ, ভেবে দেখুন আমার কথায় অসত্য কি আছে! জন্মের মুহূর্ত থেকে কেবল দুঃখের পর দুঃখ, বাধার পর বাধা, বিপদের পর বিপদ পেরিয়ে মানুষকে এগুতে হয়—শেষ পর্যন্ত সব চেয়ে চরম দুঃখ মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করার

সময়। কেউ বা অতি অকালেই মৃত্যুর কবলে ধরা পড়ে—কেউ বা কিছু পরে। কি সে পেল জীবনে! পিতা মাতা, ভাই বোন, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী বা স্বামী, পুত্র কন্যা পাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হারাচ্ছে। পাবার আনন্দ অনুভব করবার পূর্বেই আসছে হারাবার আশঙ্কা এবং এর পরই সে হারাচ্ছে—পাবার আনন্দের চেয়ে হারাবার আশঙ্কা ও বেদনাই তার অন্তরে বড় হ'য়ে ওঠে। একদিকে সে আঘাতের পর আঘাত পাচ্ছে, অপরদিকে দীনদরিদ্রের মতো যে তৃণগাছি কাছে পাচ্ছে তাকেই সে আঁকড়ে ধ'রে জীবনের আশ্রয় করছে। একদিকে সে তার সর্বস্ব হারাচ্ছে, অপরদিকে সে বাতুলের মতো ধূলিমুষ্টি সঞ্চয় করছে— যেন মহার্ঘ রত্ন সে পাচ্ছে।

"মহারাজ, এমনি প্রবঞ্চিত মানবকে যদি স্মরণ করিয়ে দিই, কি প্রবঞ্চনার ব্যবসায়ে সে নিজেকে জড়িয়ে রাখছে, তবে কি তার অমঙ্গল সাধন করা হ'ল?

"থাক, এ আলোচনায় লাভ নেই—বিদায় দিন আমাকে। আত্মপ্রবঞ্চনার সুখনীড় নিয়ে আপনারা থাকুন।"

যুবক এই ব'লে চলতে শুরু করল। রাজা তাকে থামিয়ে বললেন, "কোথায় যাচ্ছ, যুবক?"

যুবক—"জানি না, মহারাজ। দেখি এবার কে আশ্রয় দেয়। ভেবেছি পর্বতের পরপারে মেঘের ওপারে কোন দেশে চ'লে যাব। বিশ্বের অন্য কোন প্রান্তে হয়তো আমার আশ্রয় মিলতে পারে।"

মহারাজ—"সত্যই তুমি যাচ্ছ, যুবক? আর কি কখনও ফিরবে না?"

যুবক—"কেন ফিরব মহারাজ? আমি আপনার রাজ্যের অমঙ্গল। কিন্তু মহারাজ—আমি আসার পূর্বেও কি আপনার প্রজাদের সর্বাঙ্গীন সুখ ও মঙ্গলই চলছিল? আপনারই কি সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ছিল, মহারাজ? ঘুমিয়ে থাকাকে সুখ ব'লে ভুল করবেন না।"

যুবক আবার বলল—"সাহস পেলেন না, মহারাজ, জবাব দিতে।… · এবার চলি, মহারাজ।"

মহারাজ—"আর কখনও ফিরবে না, যুবক?"

চলতে চলতে যুবক বলল—"কি ক'রে বলব? এমন যে সূর্যদেব—তিনিও ত দিনের পর দিন ফিরে আসছেন।……"

আস্তে আস্তে যুবক চলতে শুরু করল। রাজা অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বনের কাকজ্যোৎস্নায় ধীরে ধীরে সে মিলিয়ে গেল।

জয়-পরাজয়

সুচেতা বলছে—"বৌদি, ঐ ঘরে কে আছে? আগে ত ঐ ঘরে কেউ ছিল না!"

বৌদি বলল—"ওদিকে নজরও দিও না, আর ওদিকে পা-ও বাড়িয়ো না।"

সুচেতা—"কেন, ওখানে কি কোন বিষধর সর্প ধ'রে রেখেছ, না কোন দুর্বাসা ঋষি এ'সে তোমাদের কাঁধে চেপেছেন?..."

বৌদি—"ওটা হ'ল কুমাব-বন? ...কুমার-বন কাকে বলে জানো ত?"

সুচেতা—"কাকে বলে?"

বৌদি—"যে বনে কুমার কার্তিকেয় বাস করতেন, যেখানে নিয়ম ছিল—কোন নাবী সেই বনে প্রবেশ করলে, সে লতা হ'য়ে যাবে,—নারীব প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ।..."

সুচেতা—"ইস্ বাপ্‌রে—এত বড় কুমাব এই কলিকালে কোথা হ'তে এসে জুটলো?..."

বৌদি—"আমার ঠাকুর-পো। নামেও কুমার, প্রকৃতিও কুমারের মতো। M.A. পড়ছে; বিয়ের কথা বললেই মুখখানা গম্ভীব ক'রে "স্থানত্যাগেন" নীতি অবলম্বন ক'রে সমস্যা এড়িয়ে যায়।..."

সুচেতা—"কিন্তু বৌদি, ওটাত' কুমার-বন না হ'য়ে

অশোকবনও হ'তে পারে। ...জানো ত' পূর্বকালে দোহদ নামে এক প্রথা ছিল। বসন্ত সমাগমেও যে অশোকতরুতে পুষ্প-সম্ভার দেখা দিত না, সুন্দরীদের পদস্পর্শে সেই অশোক গাছেও ফুল দেখা দিত।..."

বৌদি একটু হেসে সুচেতার গালে একটি টোকা মেরে বলল, "ইস্, বড় যে সৌন্দর্যের গর্ব হয়েছে; মনে করেছিস বুঝি নিজে খুব সুন্দরী, না?"

সুচেতা-ও একটু মৃদু হেসে বলল—"আমার কথা ত বলিনি,—বলেছি যে কোন সুন্দরীর কথা। সুন্দরী যদি না হই, তবে আমার পদস্পর্শে হবে না।..."

বৌদি মন্দাকিনী বলল—"আচ্ছা, চলো দেখি, পরখ করা যাক।" ব'লেই সে সুচেতার হাত ধ'রে টানল। সুচেতা হাত ছিনিয়ে নিয়ে বলল—"আমার ভারি গরজ পড়েছে! তোমাদের বাড়ির অশোকতরুতে ফুল ফুটল কি না, তার জন্য আমি আমার পায়ের ধূলি ফেলতে যাব! ইস্..."

মন্দা একটু হেসে বলল—"অশোক গাছে যদি ফুল ফোটেই তবে তোরও কিছু ফায়দা হতে পারে। ...চল, ঠাকুরপোর সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিই।..."

সুচেতা—"হঠাৎ তোমার ঠাকুরপো এখানে এলেন কেন?"

মন্দা—"ঠাকুরপো আসবে বলেই ত আমরা কিছুদিন আগে এসেছি। এখানে ব'সে ঠাকুরপো নিরালায় পড়াশুনো করবে—তার পরীক্ষা কাছে কিনা,—তা-ই বাবা আর ঠাকুরপোর দাদা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।..."

সুচেতা দুষ্টামিভরা হাসিতে মন্দার গায়ে এলিয়ে প'ড়ে বলল—"ঠাকুরপোর দাদা কে বৌদি? …হিঃ হিঃ—তার নাম কি বৌদি!…

মন্দা সুচেতার কপালে একটি অধর-স্পর্শ দিয়ে বলল—"সে যে গুরুমন্ত্র, সুচি;……তা কি অপরের কাছে বলা যায় রে?…"

সুচেতা—"উঃ ভারি আমার গুরুমন্ত্র! যদো, হরো, মেধো—যে কেউ একটা আসবে আর তার নাম-ই হবে গুরুমন্ত্র! ওঃ ভারি বয়ে গেছে আমার!…"

মন্দা—"যদো, হরো, মধো—হবে কেন! একটা ভাল দেখে নাম বেছে নিস—খুব পছন্দমতো নাম। এই ধর যেমন…"

সুচেতা—"কি থামলে যে—কি নাম তোমার পছন্দ হয়—একবার শুনি!…

এমন সময় কুমার তার ঘর হ'তে ডাকল "বৌদি,…আমার প'ড়ে প'ড়ে গলা শুকিয়ে গেল,—চা খেতে দেবে না?

মন্দা একটু জোরে বলল,—"এদিকে এসো, গলা—গলা কেন, বুক পর্যন্ত ভিজিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে।…অনেক পড়েছ, এদিকে এসো।…

কুমার বের হ'য়ে এল; সুচেতাকে দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে বলল—"না, বৌদি, আমার অনেক পড়া বাকি আছে—আমার ঘরেই তুমি চা পাঠিয়ে দিও।…" এ কথা ব'লেই, কুমার নিজের গতি ফিরিয়ে পড়ার ঘরের দিকে গেল।

সুচেতা বলল—"না, এমন একটি বেরসিক ঠাকুরপো নিয়ে

এসেছ, যে, তোমাদের বাড়ি আসাই বন্ধ ক'রতে হবে।...”
—ব'লে সুচেতা উঠবার প্রয়াস কর'ল। মন্দাকিনী তার
হাত ধ'রে বসালে ; মন্দা বলল—সবুর কর, চা খেয়ে যাও।...”

সুচেতা বসল ; কিন্তু একটু গম্ভীর মুখে সে বলল,—“না,
বৌদি, তোমাদের বাড়ির লোকজন যখন আমাদের সাপ-
বাঘের মতো ভয় করে, তখন দরকার কি আর ব'সে !
এখনও যদি মানে মানে চ'লে না যাই, তবে হয়ত শেষে
পেয়াদা-চাপরাসী দিয়ে বের ক'রে দেবে ত ?” ব'লেই সে
একটু হেসে ফেলল।

এই চপল মেয়েটি বেশীক্ষণ তার গাম্ভীর্য রাখতে পারে না।
এর মন শরতের আকাশের মতো সদা পরিবর্তনশীল ;—এক
এক খণ্ড পাতলা মেঘ আসছে, আবার বাতাসে উড়ে যাচ্ছে।
মুহূর্তের জন্য একখানা লঘু আবরণ মনের উপর পড়ে, আবার
পর মুহূর্তে তা উড়ে যায় ; মনখানা আবার সবুজ স্বচ্ছতায়
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই অল্পদিনের মধ্যেই মন্দাকিনীর সঙ্গে
তার ভাব হয়েছে ; সুচেতা যুবতী, সুন্দরী এবং আধুনিক
যুগের সাধারণ শিক্ষা তার আছে। যুগের ও বয়সের
চাপল্যের উপর তার প্রকৃতিগত একটু চাপল্যও আছে।
কথায়, কাজে, চলাফেরায়—সুচেতার সমস্ত আচরণে একটা
সহজ গতিশীলতার ভাব প্রকাশ পায়।

তার ঐ চটুল উক্তির পর একটু মৃদু হেসে মন্দা বলল—
“আমাদের বাড়িতে চাপরাসী-পেয়াদা বা দরোয়ান নেই, ঐ
কাজ ত তবে আমাকেই করতে হবে।...তার চেয়ে বসো ;
আমি গরম জল নিয়ে আসছি। চা বানিয়ে নিজেরাও খাব,

ঠাকুরপোকেও দেওয়া যাবে।…” ব’লেই মন্দা উঠে গেল। একটু পরেই চায়ের জন্য গরম জল ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে এল। সুচেতার সামনে সে সব রেখেই মন্দা তাকে বলল, “সুচি, চা-টা তৈরি কর ভাই, আমি ওঘর থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসি।……”

সুচেতার চা তৈরি হ’তেই মন্দা খাবার নিয়ে এল ; সে বলল,—“চায়ের পট-টা নিয়ে আয়।

সুচেতা—“কোথায় নিয়ে যাব ?”

মন্দা—“ঐ ঘরে—তোমাব অশোক-বনে।”

সুচেতা—“ইস্, আমার ভারি গরজ পড়েছে !”

মন্দা—“এখন দুষ্টামি করিস না, ভাই ; চল্, দেখছিস না, আমার দুই হাতই আটকা। ভয় নেই, লতা বানিয়ে ফেলবে না।” ব’লে মন্দা একটু হাসল।

সুচেতা গ্রীবা ঘুরিয়ে একটু ক্রুদ্ধ স্বরে বলল,—হাঁ, লতা বানায় আর কি ! ·····”

চা ও জলখাবারের সরঞ্জাম নিয়ে উভয়ে কুমারের ঘরে প্রবেশ করল। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বৌদিব সঙ্গে এই সুন্দবী যুবতীটিকে দেখে কুমার একটু বিচলিত হ’য়ে উঠল। স্বভাবতই লাজুক কুমাব এতকাল মেয়েদের সংস্রব এড়িয়েই চলেছে। তারপর স্কুলের জীবন থেকেই সে এক বিপ্লবী কর্মি-দলের প্রভাবে আসে। তার যৌবনের সব উন্মাদনা সে দিয়েছে দেশের মুক্তি-সাধনার চিন্তায় ও কল্পনায়। কর্মে ও চিন্তায় কৌমার্যের ব্রত বজায় রেখে দেশের স্বাধীনতা প্রয়াসে নিজেকে নিযুক্ত করবে—এই ছিল তার এতদিনের সঙ্কল্প।

তাই তার মনের চৌহদ্দির মধ্যে নারী কখনও প্রবেশ করে নি। তার উপর প্রকৃতিতেই সে একটু লাজুক। কলেজে বা সমাজের অন্য ক্ষেত্রেও সে নারী-সংস্রব এড়িয়ে চলত। বৌদি তার এই প্রকৃতি জানত। তবুও যে আজ বৌদি তাকে এমনি বিব্রত করল, এতে বৌদির উপর তার একটু অভিমান হ'ল।

আড়ষ্ট ভাবেই কুমার চা খাচ্ছিল। মন্দাকিনী একবার বলল—"ঠাকুরপো, আজ চা কেমন হয়েছে?"

নতমুখেই কুমার জবাব দিল—ভালই হয়েছে।"

মন্দা—"অন্যদিনের মতো, না তার চেয়ে ভাল, কি খারাপ?"

কুমার—"একটু চিনি বেশী হয়েছে?"

মন্দা—"তবে ত ভালই হয়েছে, তুমি ত চায়ে মিষ্টি বেশীই খাও।···"

কথাটা অবশ্য একেবারেই সত্য নয়; কুমারকে একটু ক্ষেপিয়ে প্রত্যুত্তরে টানবার জন্যই সে কথা বলল। কিন্তু কুমার প্রতিবাদ না ক'রে নতমুখে একটু অস্ফুট আওয়াজ করল "হুঁ।"

মন্দা সহজে দমবার পাত্র নয়, একটু থেমে সে আবার বলল—"ঠাকুরপো, আজ কিন্তু চা'তে চিনি বেশী দেওয়া হয়নি; মিষ্টি যে বেশী লাগছে, ওটা হাতের গুণে।···আজ চা ক'রেছে কে জানো?······সুচেতা করেছে।···"

কুমার মুখ তুলে সুচেতার দিকে মৃদু হাস্যময় দৃষ্টি ফেরাল। এবার জবাব দিল সুচেতা—"এখন চা বোধ হয় ওঁর কাছে তেতো লাগবে!···কেন বৌদি ওঁর চা-খাওয়াটা নষ্ট করলে?"

কুমার এবার চোখ তুলে সুচেতার দিকে চেয়ে বলল—"চা যে আপনি করেছেন, তা তো জানতাম না। রোজই চা বৌদি করেন এবং উনি জানেন আমি চায়ে মিষ্টি খুব কম খাই।……বৌদি খুব দুষ্টু কি না, মাঝে-মাঝেই আমাকে জব্দ করার জন্য চায়ে চিনি বেশী দেন।……"

নিতান্তই কৈফিয়তের সুরে কুমার কথাগুলি বলল। সুচেতা বলল—"বৌদি ত' আপনাকে জব্দ করেননি, জব্দ করেছেন আমাকে। আমাকে ত' চিনি কম দেবার কথা কিছু বলেননি, বরং চিনিটা উনিই এগিয়ে দিয়েছিলেন।…… বৌদি যে আমাকে…" সুচেতা তার কথা শেষ না ক'রে উঠে দাঁড়াল। মন্দা হাসতে হাসতে গিয়ে সুচেতাকে ধরল; তাকে টেনে বসিয়ে বলল—"কি হয়েছে, পাগলী?……এত সহজেই এত অভিমান! বাপরে!"

কুমার বলল—'না, না, কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন। চা-ও এমন খারাপ হয়নি।……" অত্যন্ত বিব্রতভাবে কুমার কথাগুলি বলল। সুচেতা তখনও মুখ ভার ক'রে বসে আছে, মন্দাকিনী তাকে ধ'রে রেখেছে। মন্দা বলল—"আচ্ছা, ভাই —দোষ আমারই। আর, অরসিকের পাল্লায় প'ড়ে জব্দ আমিই হ'লাম।……আচ্ছা, আর একবার চা করা যাক এবং এবার সুচেতাই সব করুক। কেমন, উভয় পক্ষই রাজি ত'?"

সুচেতার মুখে মেঘের ফাঁকে এক ঝলক রোদ দেখা দিল; গম্ভীর মুখের উপর হাসির এক তির্যক গতি খেলিয়ে সে বলল —"এবার বৌদিকে আমি ছুঁতেও দেব না।……"

মন্দা—"তাই হোক, তবুও বাপু তোমরা তুষ্ট হও।—তস্মিন তুষ্টে জগত তুষ্ট।······

সুচেতা উঠে গেল; মন্দা ওখানে ব'সেই রইল। কুমার বলল—"কেন তুমি এই হাঙ্গামা বাধালে!"

মন্দা একটু হেসে বলল—"মন্দই বা কি হ'ল?······কিন্তু ঠাকুর পো······মেয়েটি খুব ভাল, না?"

কুমার একটু ঢোঁক গিলে বলল—"কি জানি, কি ক'রে বলব?·· ···"

মন্দা—"তা একটু পার বৈ কি? · বেশ সপ্রতিভ, বেশ দুষ্টু এবং দেখতেও সুন্দর।···তাই না?"

কুমার একটু হেসে একটা ঝামটা দিয়ে বলল—"তুমি বড্ড দুষ্টু।···"

মন্দা—"কিন্তু সুচেতা আরও বেশী দুষ্টু।···এবং দেখতেও ভাল।····· তাই না ঠাকুর পো!"

কুমার এ প্রশ্ন এড়াবার জন্য বলল—"না। আমি তা হ'লে চ'লে যাব।"

এমনি সময় সুচেতা চা নিয়ে এল। পেয়ালাতে চা ঢে'লে দিয়ে, সে এক পাশে বসল; মন্দা বলল—"সুচি, তুমি যে চা নিলে না?"

সুচেতা—"না, আমি আর খাব না।······"

মন্দা—"তা হ'লে আমরা-ও খাব না।"

কুমার চা'র পেয়ালা রেখে বলল—"তাই ত'। এত কষ্ট ক'রে চা বানিয়ে আনলেন, আর আপনি খাবেন না, এটা কি ভাল হচ্ছে?"

মন্দা—"না, ঠাকুর পো, তা হয় না; ঐ পট থেকে তুমি চা ঢেলে দাও।......"

অগত্যা কুমার চা'র পটটা উঠাল; তখন সুচেতা তাড়াতাড়ি উঠে কুমারের হাত থেকে চা'র পাত্রটি নিল। গরম চা'র পাত্রটি হস্তান্তরিত হবার সময় উভয়ের হাতের পরস্পর স্পর্শ হ'ল। পাত্রটি নিয়ে ত্বরিতপদে ফিরবার সময়, সুচেতার উন্মুক্ত কেশাগ্র কুমারের বাহুতে একটু স্পর্শ রেখে গেল।

(২)

সুশান্তবাবু স্থানীয় গৃহস্থ; কুমারদের বাড়ির পাশেই তার বাড়ি। তাঁর জীবন যাত্রা চ'লেছে সেই প্রাচীন প্রথায়। চাষের ক্ষেত-ও তাঁকে নিজের হাতে চাষ করতে হয় না; প্রজাদের কাছ হ'তে যে খাজনা পান, সেই টাকা-ও তাঁকে পরিশ্রম ক'রে উপার্জন করতে হয় না। অথচ এই দুই উপায়ে যে অর্থ তিনি পান, তাঁর নাতিক্ষুদ্র সংসারের পক্ষে তা এখনও প্রায় পর্যাপ্ত। কিন্তু যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের খরচ ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে; অথচ আয়ের পরিমাণ না বেড়ে বরং ক্রমে কমছে।

সুশান্তবাবু তাঁর বাল্যে পিতৃ-পিতামহের যে স্বাচ্ছন্দ্য দেখেছেন, আজ আর তা নেই। বরং মাঝে মাঝে কোন আকস্মিক ব্যয় এসে পড়লে, তাঁকে বেশ বিব্রতই হ'তে হয়। অভাবের আলিঙ্গন যে ক্রমে মৃদু হ'তে নিবিড় হচ্ছে, তা বুঝতে পেরেও কোন প্রতিকার করতে পারেন নি। বংশানু-

ক্রমিক সংস্কার ও বাল্যাবধি অভ্যস্ত চাল ত্যাগ করে—শ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে পারছিলেন না। বিবাহের পর তার সংসার ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে; ছেলে মেয়েরা সংখ্যায়ও বাড়ছে, বয়সেও বাড়ছে। এমন অবস্থায় তাঁর স্ত্রী সুজাতার অসুখ উপলক্ষ্যে সুজাতার বোন সুচেতা এখানে আসে।

সন্তান প্রসবের পর দীর্ঘ অসুখে সুজাতা একেবারে শয্যাশায়ী হয়। আমাদের পূর্বোক্ত ঘটনা হ'তে কয়েক মাস পূর্বের কথা সে সব। এখানে এসে অল্পদিনের মধ্যেই মন্দাকিনী ও তার স্বামী রমেশের সঙ্গে সুচেতার ভাব হ'য়ে গেল। রমেশ সুজাতাকে ডাকত দিদি; সেই হিসাবে সে হ'ল সুচেতার দাদা এবং মন্দা হ'ল ওর বৌদি।

* * * *

কুমারের পাঠগৃহে এখন সুচেতা কখনও কখনও যায়। মন্দা উভয়ের খরচায় এ নিয়ে কিছু হাসি ঠাট্টাও করে। প্রথম হ'তেই মন্দার লোভ পড়েছিল সুচেতার উপর। সুচেতার দেহ ও মনের চটুল চট-পটে ভাব, চলা ফেরার ও কাজ করার সপ্রতিভ ও স্বচ্ছন্দ গতি, তার সুঠাম দেহশ্রী—সব দিয়ে সুচেতা মন্দার মনে এক স্নেহ সিক্ত আসন দখল করেছিল। কুমারের নারী সংস্রব বর্জনের চীনা প্রাচীরে যে ভাঙ্গন লেগেছে, তা মন্দাকিনী দেখছে; কিন্তু কুমারের মনের কোন একটু অংশ সুচেতা দখল করেছে কিনা, মন্দা তখনও তা জানতে পারে নি।

গ্রামের শান্ত গগনে আর একটি গ্রহ দেখা দিল; সেটি হ'ল—সুশান্তবাবুর জ্ঞাতি নাতি সুবিনয়। সম্পর্ক হিসাবে

সুবিনয়ের পিতা সুশান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র; সুবিনয় তাঁর নাতি পর্যায়ের। সুবিনয়ের পিতা পূর্ব হ'তেই গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে অর্থ উপার্জনে মন দিয়েছিলেন; তাই আর্থিক সঙ্গতির অভাব সুবিনয়ের ছিল না। স্কুল-কলেজে সরস্বতীর সাধনায় বৃথা পরিশ্রম ক'রে, সে এখন ব্যবসায় ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর সাধনায় ব্যস্ত। সুশান্তবাবুর গৃহে সুবিনয়ের অবাধ প্রবেশ; তাই সুচেতার সঙ্গে তার পরিচয় হ'তে বেশী দেরী হ'ল না। দিদিমার বোন হিসাবে সম্পর্কও একটু মধুর; তাই সুচেতার সঙ্গে মেলা-মেশায় সুবিনয় বেশ সহজ ও সপ্রতিভ ছিল। তার যৌবন-মত্ত মন যে সুচেতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, তা বুঝতে সুশান্তবাবুর ও তাঁর স্ত্রীর দেরী হ'ল না।

স্ত্রীর আরোগ্যলাভ ও খোকার নামকরণ উপলক্ষে সেদিন সুশান্ত বাবুর বাড়িতে একটু সামান্য ভোজের আয়োজন হয়েছে। সুবিনয়ই এই উৎসবের কর্ম-কর্তা; বাহিরের কর্ম-ভার তার উপরে—ভিতরের ভার সুচেতার উপরে। দায়িত্বের ভাগাভাগির সূত্র ধ'রে সুবিনয় আজ বহুবার সুচেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা ক'রেছে। সুজাতা তার এই প্রয়াসকে বরাবরই প্রশ্রয় দিয়েছে; ছোট বোনের ভাবী বর হিসাবে সুবিনয়কে তার পছন্দও হয়েছে।

বিকেল বেলা অতিথিদের খাওয়া-দাওয়ার পূর্বে সুচেতা মন্দাকিনীকে বলল—"বৌদি, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে ত'।"

মন্দা বলল—"আমার ভারি গরজ পড়েছে— নিমন্ত্রণ বাড়ির খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ ফেলে আমি তোমাকে পাহারা দেব।..."

সুচেতা—"ওসব দুষ্টুমী রেখে দাও, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে—প্রত্যেকটি মুহূর্ত। নইলে সব ফেলে দিয়ে, আমি গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে শুয়ে থাকব।..."

মন্দাকিনী একটু হেসে বলল—"কেন রে, কি হয়েছে? জামাইবাবুর চোখ পড়েছে?..."

সুচেতা—"যা' তা' বলো না। ঐ যে কে সুবিনয় না দুর্বিনয় এসেছে—দেখ না, ছুতায় নাতায় মিনিটে একবার ক'রে তার পরামর্শ করা চাই।"

মন্দাকিনী একটু হেসে বলল—"মন্দ কি! সুবিনয় বাবুকে মনে ধরছে না?...সে ত' বেশ ভাল বর হবে রে।..."

সুচেতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বলল—"হ'ক গিয়ে ভাল বর, আমার দরকার নেই।..."

বলতেই তার চোখ ছল ছলিয়ে উঠল। মন্দা তার চিবুক ধ'রে একটু আদর ক'রে বলল—"তবে কাকে তোর পছন্দ হয়? ."

সুচেতা—"জানি না।..." এবার তার চোখের কোণে দু'ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল। মন্দা তাকে বুকের কাছে টেনে এনে বলল—"ছিঃ, পাগলী!..আচ্ছা, আমি থাকব তোর সাথে।"

রাত্রে নিমন্ত্রিতদের খাওয়া হ'য়ে গেল। বাড়ির ও পাশের দুই বাড়ির লোক খেতে বসেছে। কুমার এবং সুবিনয়ও সেই সঙ্গে আছে; সুজাতা পাশে একটা চৌকিতে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শুয়ে আছে। সুজাতা বলল—"আজ সুচি খুব খেটেছে;—দিনভর খাটুনি গিয়েছে।..

সুশান্ত বলল—"বুঝলে হে সুবিনয়—যে তরকারীটা সুচেতা পাক ক'রবে, খেয়েই তা বলতে পারবে—হয় তাতে লবণ কম হবে, না হয় লবণে পুড়ে যাবে।…"

সুজাতা বলল—"কেন মিছা-মিছি ওকে চেতাচ্ছ…এমন-ই দিনভর খেটেছে।…"

সুশান্ত—একটু হেসে বলল—"কি খাটুনী-ই খেটেছে।… এক বেলা ত পাক ঘরের কাজে যোগাল দিয়েছে…তা-ও যদি পাক ভাল হত, তবে না হয় একটি বর যোগাড় ক'রে দেওয়া যেত! কি বল হে সুবিনয়?…"

সুবিনয় বলল—"কেন, পাক ত' বেশ ভালই হয়েছে। কেন আপনি মিথ্যা ক'রে এসব বলছেন! ‥"

সুশান্ত—"ও, তবে ভায়ার পছন্দ হ'য়েছে! তাই বল।… শুনছ হে কুমার · আমরা ইতর লোক—একটু মিষ্টান্ন জুটলেই আমরা সুখী।…তবে সেটা যা'তে দুপক্ষ থেকেই হয়, তার অবশ্য ব্যবস্থা ক'রতে হবে।…"

কুমার একটু হেসে বলল—"সে ত' খুব ভাল কথাই; মিষ্টান্ন ভোজনে কি আর আমাদের আপত্তি আছে! "

সুশান্ত—"কি বল, সুচেতা, একপক্ষের ত' মত পাওয়া গেল; তোমার ত' মৌন-সম্মতির লক্ষণ ব'লে ধ'রতে হবে; না!…"

সুচেতা এতক্ষণ মন্দাকিনীকে নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে জবাব দিল—"কেন, আমার কি মুখ নেই! আমি কি বোবা! আমি ত' বেশ কথা ব'লতে পারি; মতামত দিতেও পারি।…"

ব'লেই সুচেতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আজ সমস্ত দিনই তার মেজাজটা রুক্ষ ছিল। কিছুদিন যাবৎই সে দেখছিল, তার দিদি ও জামাই বাবুর সঙ্গে সুবিনয়ের যেন একটা গোপন ষড়যন্ত্র চলছিল, সকলেরই চেষ্টা ও অভিপ্রায় সুবিনয়ের হাতে তাকে সমর্পণ করা। কিন্তু সুবিনয়কে তার পছন্দ হচ্ছিল না। তার সমস্ত আচরণের মধ্যেই কেমন একটা দেখনাই ভাব; তার মধ্যে সাংস্কৃতিক ভব্যতার চেয়ে সভ্যতার বৈভবের আড়ম্বরই ছিল বেশী। সুবিনয়ের গায়-পড়ে খাতির করার প্রচেষ্টার পাশে, সুচেতার মনে জাগে কুমারের একান্ত আত্ম-অপসারণের প্রকৃতি; সুবিনয়ের আত্ম-প্রচারের ভাব দেখলেই সুচেতার মন তুলনা করে কুমারের আত্ম-ভোলা কোমল প্রকৃতির সঙ্গে। আজ সমস্ত দিন সুবিনয় তাকে জ্বালাতন ক'রেছে; তার উপর এখন আবার সেই অশিষ্ট লোককে সবাই মিলে আস্কারা দিচ্ছে;—এটা তার নিকট অসহ্য বোধ হ'ল।

এমন ভাবে সে ঘর থেকে চ'লে যাওয়াতে সবাই একটু বিব্রত বোধ করছিল। কিন্তু সুশান্ত রীতিমতো রেগে গেল; সমাজের যে স্তরে সে বাস ক'রছে, তাতে মেয়েদের তরফ হ'তে এমনি আচরণ সহ্য করার প্রথা নেই। তার রাগ গিয়ে পড়ল সুজাতার উপর—"বোনকে ত খুব শিক্ষা দিয়েছ। এমনি বেহায়াপনা এখানে চলবে না।"

সুজাতা যদিও সুচেতার আচরণ অনুমোদন করতে পারছিল না, কিন্তু স্বামীর এই অতর্কিত অন্যায় বিস্ফোরণে, সে বোনের ও নিজের আত্ম-সম্মানে আঘাত বোধ করল। সে

বেশ ক্রুদ্ধভাবেই জবাব দিল—"কেন, তোমাকে পূর্বেই সতর্ক ক'রে দিয়েছি—সমস্ত দিন মেয়েটা খেটেছে, তাব উপর ওর সঙ্গে লাগতে গেলে কেন।·ওর বিয়ে দেওয়ার ভার কি তোমার উপর কেউ দিয়েছে?···নিজে দাসী চাকর রাখতে পার না, তাই আমার বোনকে নিয়ে এসেছ। তাই ব'লে কি সে সত্যই তোমার দাসী-চাকর হ'য়ে গিয়েছে! ও'কে আর ঘাটিও না; তোমার না পোষায়, ও'কে পাঠিয়ে দাও।···"

স্ত্রীর কথার প্রত্যুত্তর দিতে আর সুশান্তের সাহস হ'ল না। স্ত্রীর মুখের কাছে, সে বরাবরই মুখ বুজে স'রে যায়। হঠাৎ একটা উষ্ণ হাওয়ার দমকা দাপটে ঘরে একটা থমথমে আবহাওয়াব সৃষ্টি হ'ল।

ভোজের শেষে সবাই যখন ব'সে ছিল, তখন কুমার সুবিনয়কে বলল—"সুবিনয়বাবু, আমাকে চিনতে পারলেন না? ·· এক বছর এক সঙ্গে পড়েছি।···"

সুবিনয় একটু চিন্তা ক'রে বলল—"হাঁ, একটু যেন মনে পড়ছে।···"

কুমার—"Second yearটা এক সঙ্গে পড়েছি;—অবশ্য ঠিক এক বছর নয়—আমি ছিলাম regular section-এর আর আপনি অন্য sectionএ ছিলেন।"

সুবিনয়—"হাঁ, এবার মনে পড়েছে।·মনে কি ক'রে থাকবে, বলুন! আমরা ত' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ আনতে যাইনি;—আমার উদ্দেশ্য ছিল—বেছে বেছে লোকজনের সঙ্গে মেলা-মেশা ক'রে, ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা।···আর

আপনারা থাকতেন বই নিয়ে।···আপনাদের সঙ্গে মেলা-মেশার তেমন প্রয়োজন হয়নি।”

তার জবাবের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে আহত হ'য়ে কুমার বলল—“তা ত' ঠিকই; যদি পরীক্ষায় পাশ করাই উদ্দেশ্য হ'ত, তবে কি আর বছর বছর এক ক্লাশেই থাকতে হয়!···আচ্ছা, পরের বছর আপনি কলেজ ছাড়লেন কেন?...কি যেন হয়েছিল!···”

ব'লেই সে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। সুবিনয়ের কলেজ ত্যাগ সম্বন্ধে একটা কৌতূহল সকলের মনেই জাগল;—এমনি ভাবে প্রশ্ন ক'রে কুমার কি যেন একটা গোপন কথার ইঙ্গিত করল। অনাবশ্যক সে যে কেন সুবিনয়ের প্রতি মনে বিরক্ত ও আচরণে রুক্ষ হ'ল, তা সে নিজেই বুঝতে পারল না। ঘরের বাইরে গিয়ে তার মনটা একটু সঙ্কুচিত হ'ল। কিসের জ্বালা তার আচরণে প্রকাশ পেয়েছে? ঐ সেবাপরায়ণা মেয়েটির প্রতি অযথা নির্যাতনের উপলক্ষ হ'ল সুবিনয়; তাই কি এই উষ্মা? কিন্তু কেন?

(৩)

মন্দাকিনীর বিছানায় শুয়ে মন্দা ও সুচেতা কথা বলছিল। মন্দার ছোট্ট খোকাটি একপাশে শুয়েছিল। মন্দা বলছিল—“কেন, তোর আপত্তি কি?”

সুচেতা—“আমার ভাল লাগছে না,—এই আমার আপত্তি; আবার আপত্তি কি!

মন্দা—“ভাল না লাগার ত একটা কারণ থাকে—কেন

ভাল লাগছে না ? অবস্থা ভাল, দেখতে-শুনতে ভাল, বেশ চট-পটে।......

তাকে বাধা দিয়ে সুচেতা বলল—"থাকগে তোমার ঐ সুখ্যাতি ;......আমার পছন্দ হয় না—বাস্।"

একটু হেসে মন্দা বলল—"তুই বুঝিস্ না, বোন, আমাদের পছন্দ-অপছন্দের কথা কি কেউ জিজ্ঞাসা করে।... যেখানে হ'ক গছিয়ে দেয় ; তা-ই আমাদের ভাল লাগাতে হয়।......

সুচেতা—"দেখ, এটা যুক্তি নয় ; এটা অন্যায় অত্যাচারের কথা। চিরকাল চলেছে ব'লে আরও চিরকাল তা মেনে চ'লতে হবে এমন কোন কথা নেই।......তাছাড়া যদি আমি কাউকে না দেখতাম না জানতাম, নিজের মনে পছন্দ-অপছন্দর কথা না আসত, তবে যাকে পেতাম তাকেই হয়ত যৌবনের মত্ততায় পছন্দ ক'রে নিতাম।...সে ছিল স্বতন্ত্র কথা।...কিন্তু আজ আমার পছন্দ-অপছন্দর কথা এসেছে। যাকে খুসী আমার ঘাড়ে গছিয়ে দেবে, আজ আর তা চলে না।..."

সুচেতার শায়িত মস্তকটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মন্দা বলল—"অপছন্দটা ত' বুঝলাম, পছন্দটা কি ?..."...ব'লে সে মৃদু হাসতে লাগল এবং সুচেতার মাথায় হাত বুলাতে লাগল। মন্দার মনে একটু সন্দেহ জাগল, একদিন এই মেয়েটী সম্বন্ধে সে একটা আশা পোষণ করেছিল, আজ সেই আশার কথা মনে হ'য়ে শঙ্কিত হ'ল ;—হয়ত এই মেয়েটীর এই ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য সে-ই দায়ী।

সুচেতা কিছু বলল না ; মন্দার বুকের কাছে উপুড় হ'য়ে সে মাথা নীচু ক'রে প'ড়ে রইল। একটু পরে মন্দা বলল—

"সুচেতা······একি, তুই কাঁদছিস?" সুচেতার কান্না এবার সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙ্গে খরস্রোতে বের হ'ল। মন্দার এবার আর কোন সন্দেহ রইল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলল—"চেতা, আমিই তোর এই দুঃখের কারণ। সব কথা তবে শোন।······

মন্দা বলতে লাগল—"আমি সত্যই চেয়েছিলাম ঠাকুরপোর জন্য তোকে ঘরে আনি; খুবই লোভ হ'য়েছিল। কিন্তু আজ আর আমার সেই সাহস নেই।······একটা কথা তোকে বলি। ঠাকুরপো স্বদেশী হাঙ্গামায় জড়িত আছে। পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্যই সে এখানে এসেছে। কিন্তু তবুও পুলিশ তাকে ছাড়ছে না। যে কোন দিন হয়ত তাকে পুলিশে ধ'রে নেবে; কত বছর তাকে জেলে থাকতে হবে কে জানে!······এই অবস্থায় এই ধূমকেতুর সঙ্গে তোর ভাগ্য জুড়ে রাখতে আমার মন বলে না।······তাছাড়া, তার মনের ও মতের কোন ঠিকানা পাই না।"

সুচেতা—"সে ত আর চুরি জুয়াচ্চুরী ক'রে জেলে যাচ্ছে না।···পরাধীন দেশে দেশকে ভালবাসার দণ্ড ত গৌরবের।"

মন্দা—"কিন্তু তাতে ত তোর দুঃখ কমবে না······ধর যদি আজ ঠাকুরপো জেলে যায়, কবে ফিরবে কে জানে!"

সুচেতা—"এত সুখ দুঃখের হিসাব ক'রে মানুষের জীবন চলে না, দিদি।······মানুষের মন যখন যে ধারায় বইতে সুরু করে তখন তার গতি ফিরানো যায় না—তা উচিতও নয়।"

মন্দা একটু বিস্মিত হ'ল;—হঠাৎ সুচেতা তাকে দিদি

ব'লে সম্বোধন করল কেন? তবে কি সুচেতা নিজের মনে একটা সঙ্কল্প ক'রে নিয়েছে? সে একটু শঙ্কিতই হ'ল—কার সঙ্গে এই সুশ্রী সুচরিতা মেয়েটীব ভাগ্য সে জুড়ে দিল! এই মেয়েটীর প্রতি তার একটা সত্যিকার স্নেহ জন্মেছিল, এব ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে তার মন মমতায় ভ'রে উঠল। বুকের কাছে তার মাথাটী টেনে নিয়ে মন্দা তার মাথায় ও পিঠে হাত বুলাতে লাগল। একটু পরে মন্দা বলল—"চেতা, এমনি ক'রে যে নিজেকে বাঁধছিস, ঠাকুরপোর মন ত তুই জানিস না। সে যে পাগলা প্রকৃতির লোক, সে যদি তোকে না চায়?......"

সুচেতা—"তাঁর মন সত্যই জানি না; উমা ত মহাদেবের মন জানত না, দিদি।......তবুও আমি যে একটু আশা না করি, তা নয়"

মন্দা—"যদি তোর আশা ব্যর্থ হয়? আমার খুবই ভয় হয়, চেতা।"

সুচেতা—"পাহাড় থেকে যখন নদীর ক্ষীণ ধারা বের হয় —সাগরের দিকে যখন সে তার যাত্রা সুরু করে, সাগর তাকে গ্রহণ করবে কিনা এই ভয়ে কি সে ফিরে যায়? তার নিজের গতির উপর তার বিশ্বাস আছে—সাগরে গিয়ে সে একদিন পৌঁছাবেই। সেই বিশ্বাসে ভর ক'রেই সে ছোটে......এবং ক্রমেই তার গতি ক্ষিপ্র ও প্রবল হয়।"

এর পর আর মন্দার বলবার কিছু রইল না। একটু থেমে সে বলল—"আর কি তোকে বলব! প্রার্থনা করি জীবনে সুখী হ'স। তোর মনোবাসনা পূর্ণ হোক। তোকে

ছোট বোনের মতো স্নেহ করি ; ছোট বোন ক'রে যেন ঘরে আনতে পারি।”

(৪)

সে রাত্রের পর কুমারের মনে একটা প্রশ্ন জাগল— সুচেতা এমনি আচরণ করল কেন? বিবাহের বর হিসাবে সুবিনয় ত অযোগ্য নয়। কিন্তু সুচেতার ঐ আচরণ তার মনের অবচেতন কোণে সুখের গুঞ্জন তুলল ; কেন যেন তার মনটা এতে সুখী হ'ল। সুবিনয়ের সঙ্গে সুচেতার বিয়ে হ'ল কি হ'ল না, এতে তার কি আসে যায়! আত্মানুসন্ধানের অনুবীণ দিয়ে নিজের মনের প্রতি রন্ধ্র সে দেখল। এক কোণে সর্ষপ পরিমাণ একটি রঙীন বিন্দু দেখা গেল ; সন্দেহ, কৌতূহল, আত্মানুসন্ধানের অনুকূল আবেষ্টনে দিনের পর দিন সেই রঙীন বিন্দুটি আকারে যেন বেড়ে চলছিল। তবে·····? তবে কি সত্যই তার মনে লোভের রঙীন মেঘ দেখা দিয়েছে? না তা ত হ'তে পারে না··· তার যে এ পথ নয়।······বন্ধনের প্রসারিত বাহু তাকে বেষ্টন করতে আসছে ; তার পূর্বেই যে তাকে এই বন্ধনকামী বাহুসীমার বাইরে চ'লে যেতে হবে।

আজ যায়—কাল যায়—কিন্তু তবুও যাওয়া হয় না। নিজেদের কর্মপন্থার নির্দেশে সে এখানে এসেছে,—আত্ম-গোপন ক'রে আত্মরক্ষার জন্য নয়—পুলিশের প্রখর দৃষ্টি থেকে নিজেকে দূরে রেখে সময় ও প্রয়োজন মতো বৃহত্তর দায়িত্ব নেবার জন্য। ইতিমধ্যে একদিন সেই দায়িত্বের

আহ্বান তার এসে গেল ;—মনের সমস্ত শৈথিল্য বর্জন ক'রে ধীর পদে কর্তব্যের পথে তাকে এগুতে হবে। আজ আর কোন সংশয় কোন পিছুটান তার মনকে দোলায়িত করতে পারল না।

হঠাৎ একদিন রাত্রে কুমার চ'লে গেল, যাবার পূর্বমূহূর্তে সে মন্দাকিনীকে বলল—তার আহ্বান এসেছে আজই যেতে হবে।

মন্দা প্রথমটা স্তম্ভিত হ'ল; এমনি অতর্কিতভাবে তার চ'লে যাওয়ার জন্য মন্দা প্রস্তুত ছিল না। একটু থেমে সে বলল—"এই কি তোমার সঙ্কল্প ?" কুমার একটু হেসে বলল —"বৌদি, আমার উচিত ছিল কাউকেই না ব'লে যাওয়া; আমি যাচ্ছি অজ্ঞাতবাসে, অজ্ঞাত ভাবেই যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তোমাকে না ব'লে যেতে পারলাম না,—তুমি বাধা দিও না।"

মন্দা—"বাধা আমি দেব না—দিলেও তুমি মানবে না।··· কিন্তু ঠাকুরপো—আজ একটা কথা তোমায় না ব'লে পারছি না। "

কুমার –"বল"

মন্দা—"সুচেতা তোমায় ভালবাসে ;—সেই নিমন্ত্রণের রাত্রের কথা মনে আছে ? সে তোমাকেই চায়।"

একটু ইতস্তত ক'রে কুমার বলল—"আমার জীবনের সঙ্কল্প ত তুমি জান। তাঁকে বিরত হ'তে ব'লো। জীবনে তিনি সুখী হউন, এই আমি চাই। কিন্তু এই পথে ত তিনি সুখ পাবেন না—পাবেন দুঃখ।···আজ যে যাত্রা আমার শুরু

হ'ল তার শেষ কোথায় আমিও জানি না! মৃত্যুও মিলতে পারে; কারাগার ত' অগত্যা মিলবেই।...এ পথে আমি তাঁকে দোসর জুটাতে চাই না;—তাই বলছি, তাঁকে বিরত হ'তে ব'লো।"

মন্দা—"তোমার এই মনের ভাব আশঙ্কা ক'রে আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সে তার সঙ্কল্পে স্থির।"

কুমার—"তবুও তাঁকে ব'লো এপথে তাঁর মঙ্গল নেই। "

মন্দা—"আমি এমনও বলেছি—তুমি যদি তাকে না চাও তবে তার সঙ্কল্পের পরিণাম কি হবে। ..তার উত্তরে সে উমার তপস্যার কথা বলে। সে বলে—উমা কি মহাদেবের মন জেনে মহাদেবকে প্রার্থনা করেছিল!..."

কুমার একটু থেমে খুব শান্ত কণ্ঠে বলল—"তবে তাঁকে বলো বৌদি—উমার সাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না;—সেই ধৈর্য, সেই সহনশীলতা, সেই শক্তি থাকা চাই—যার বলে উমার মতোই যেন তিনি বলতে পারেন—'মনোরথানাম্ অগতিঃ ন বিদ্যতে'—মনোবাসনার অগম্য কিছুই নেই। এই শক্তির বলেই উমা বলতে পেরেছিলেন—ন কামবৃত্তিঃ বচনীয়ং ঈক্ষ্যতে—নিজের একান্ত বাসনার দ্বারা যে চালিত হয় সে লোকাপবাদে ভ্রূক্ষেপ করে না।.. উমার এই একাগ্র সাধনার উত্তরে মহাদেব যা বলেছিলেন, তাও তাঁকে মনে করিয়ে দিও—'অদ্য প্রভৃতি, অবনতাঙ্গি! তবাস্মি দাসক্রীতঃ তপোভিঃ'—হে অবনতাঙ্গি, তোমার তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে আজ হ'তে তোমার ক্রীতদাস হ'লাম।"

মন্দা—"কিন্তু এত কথা আমি বলতে পারবনা ; এসব ত মনে থাকবে না।"

কুমার—"বেশ আমি লিখে দিচ্ছি।…"ব'লে এক টুকরা কাগজে সে কি লিখে মন্দার হাতে দিল।

তারপর রাত্রির অন্ধকারে সে বেরিয়ে গেল। মন্দা চোখের জল মুছতে মুছতে তার অপস্যয়মান মূর্তি অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখল।

ছয় বছর প'র কুমার জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। শরীর কৃশ হয়েছে মুখের শ্রীতে কারাজীবনের কালিমার ছাপ পড়েছে ;—কিন্তু আজও তার বুদ্ধির ও অন্তরের দীপ্তি নিভে যায় নি। কিন্তু এই কয় বছরে মন্দা অনেকটা প্রবীণা হ'য়েছে ; সেই চাঞ্চল্যের স্থলে তার মুখে চোখে গৃহিণীর দায়িত্ববোধের ছাপ দেখা দিয়েছে।

কুমারের প্রশ্নের উত্তরে মন্দা বলছে—"তুমি চ'লে যাওয়ার কিছুদিন পরই সুচেতা তার পিতৃগৃহে চ'লে গেল ; যাওয়ার সময় তোমার লেখা কাগজের টুকরা দেখিয়ে বলল—'দিদি এটাই আমার সনদ।'—বছর দুই পর খবব পেলাম তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না ; শুনেছি সে নাকি আত্মহত্যা করেছে। ….

"সেই নিমন্ত্রণ রাত্রের অপমানের কথা সুবিনয় ভুলতে পারল না, তাই তার জেদ চেপেছিল—যে ক'রে হোক সুচেতাকে পেতে হবে। যার অর্থের বল আছে—কন্যার পিতামাতাকে হাত করতে ত তার দেরী লাগবে না। সুচেতা কিছুতেই সম্মত হয় না, প্রথম এল অনুরোধ, তারপর উপদেশ, আদেশ, জুলুম, পীড়ন—সব অস্ত্রই চলল।…মেয়েদের এত

জেদ ও স্বেচ্ছাচার কি কেউ সহ্য করে! লাভের মধ্যে হ'ল—তোমার নাম জড়িয়ে নানা কুৎসা রাষ্ট্র হ'তে লাগল।...উমার উপমা দিলেই ত হ'ল না। সমাজে বাস করতে গেলে এমনি ক'রে কি চলে! তোমার দীর্ঘ দণ্ড হ'য়ে গেল; কবে তুমি আসবে তার ঠিক নেই।..ও'র দিদি সুশান্তবাবুর স্ত্রী আমাকে একটা চিঠি দিলেন—অনুযোগ করলেন খুবই;—তোমার মনের গতি এত বছর পরে কি হবে কে বলতে পারে।...

"এত বছর পরে তোমার মনের ভাব কি থাকবে—তা ত' আমার পক্ষেও বলা সম্ভব ছিল না। আমিও সুচেতাকে একখানা চিঠি দিলাম—পুরাণো কথা ভুলে যাওয়াই ভাল! সে আমাকে জবাব দিল—'দিদি, তুমিও সন্দেহ করছ' · তারপর হতভাগিনী এই কাজ করল। নিজেও মরল, আমাকেও দোষী ক'রে গেল। ...কিন্তু আমার কি দোষ বল ত', ঠাকুর পো।...মেয়ে মানুষের কি এত জেদ সাজে! ...এখন মনে হয় এমন এক গুঁয়ে মেয়ে যে তোমার ঘাড়ে চাপে নি, ভালই হ'য়েছে।...মেয়ের কি অভাব! কত সম্বন্ধ এর মধ্যেই এসেছে।...ভাল পাশ করা সুন্দরী মেয়ে।..."

খালাস হ'য়ে প্রায় একমাস পর সে দাদা ও বৌদির কাছে এসেছে। সংসারে বহু পরিবর্তন হয়েছে; তার মধ্যে সব চেয়ে বড় পরিবর্তন দেখল তার বৌদির। তরল চাপল্যে যে টলমল করত, ঠাকুরপোর সব খেয়ালকে যে প্রশ্রয় দিত, দায়িত্বহীন স্নেহের স্নিগ্ধ ধারায় যার মন সদা সবুজ থাকত, আজ তাঁর মধ্যে সব চেয়ে বড় বৃত্তি হ'ল - গিন্নীর দায়িত্বপূর্ণ সজাগ দৃষ্টি।

সুচেতা যে তার অবিমৃষ্যকারিতা ও এক-গুঁয়েমির ফলভোগ করার ভয়েই আত্মহত্যা করেছে এবং এই আত্মহত্যা ক'রে সে যে কুমার ও তার পরিজনদের প্রতি দুষমনি করেছে, এই বিষয়ে মন্দার মনে কোনই দ্বিধা নেই। কুমার বড় আশায় এসেছিল—বৌদির স্নিগ্ধ ধারায় তার রুদ্ধ যৌবনের বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নকে আবার সঞ্জীবিত ক'রে তুলবে। সুচেতার আত্মহত্যার কথা জেল হ'তে খালাস হ'য়ে শুনেছে।

তার মনে খুব আশা ছিল বৌদির সঙ্গে সে সুচেতার প্রসঙ্গ আলোচনা করবে; অন্য কারুর সঙ্গে ত তা সম্ভব নয়। কিন্তু এরপর সুচেতার প্রসঙ্গও সে আর বৌদির কাছে তুলতে সাহস করল না! এ প্রসঙ্গ তার মনের নির্জন কোঠার ধন হ'য়েই রইল;—বাইরের স্পর্শ পাছে একে কলুষিত করে, এই ভয়ে সুচেতার স্মৃতিকে সে মনের মধ্যে নিবিড় আলিঙ্গনে রেখে দিল। দীর্ঘ জেল বাসের ধূলি ময়লাতে যে স্মৃতি অনেকটা ম্লান হ'য়ে ছিল, এই সযত্ন ও সংগোপন সংরক্ষণে তা আবার সজীব হ'য়ে উঠল।

নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কয়দিন সে ভাবল। লোক-সঙ্গ এড়াবার জন্য ঐ কয় দন প্রায় সময়ই সে বাইরে বাইরে থাকত।

একদিন আবার হঠাৎ সে ঘর ছেড়ে বের হ'ল; যাবার পূর্বে বৌদিকে বলল।

মন্দা বলল—"কি করবে কিছু ঠিক করেছ?"

কুমার—"ঠিক ত বহু বছর পূর্বেই করেছি ; আর নূতন ক'রে ঠিক করার কিছু নেই।

মন্দা—"অর্থাৎ— ?"

কুমার—"বৌদি, দেশ ত আমর এখনও স্বাধীন হয় নি। আমার কাজও এখনও শেষ হয় নি।..."

এবার আর মন্দার চোখ অশ্রুসিক্ত হ'ল না ; একটু পরে সে বলল—"ঠাকুর পো, ভাল ভাল কয়েকটা সম্বন্ধ হাতে ছিল। তোমাকে ত বলেছি ;—তোমাব দাদা ত জবাব চাইবেন ; কি বলব ?...

কুমার—"ঐ ত বললাম—আমার পথ এখনও শেষ হয় নি। · আর নূতন কিছু বলার নেই।"

মন্দা একটু বিদ্রূপের স্বরে বলল—"সুচেতা বেঁচে থাকলে ত পথ শেষ হ'ত ; তার অভাবেই কি পথের শেষ ফুরিয়ে গেল ?

কুমার ব্যথাহত দৃষ্টিতে মন্দাব মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল ; —ভাবল এই তার সেই বৌদি। সে শান্ত কণ্ঠে বলল—"হয়ত তা-ই"। আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে এল। ঐ বদ্ধ ঘরের হাওয়া, বৌদির দৃষ্টি—সবই যেন তার অসহ্য বোধ হচ্ছিল। তার কেবলই বোধ হচ্ছিল—মানুষের মন ছোট গণ্ডীকে জড়িয়ে থাকতেই চায় ; মনের সব কোমল বৃত্তি ঐ গণ্ডীর ভিতরেই তার আবদ্ধ...মানুষ কি এতই স্বার্থ-কেন্দ্রীভূত।...

(৬)

কয় বছর পরের কথা। সুবিনয় ইতিমধ্যে বনেদী ধনী সমাজে স্থান ক'রে নিয়েছে। অর্থে, বিলাসে, সামাজিক আড়ম্বরে—সে ধনী সমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য। সুচেতার মৃত্যুর পর এক শহরবাসী ধনীর সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যাকে সে বিয়ে করেছ। তার পত্নী প্রীতা সব রকমেই আধুনিকা। সুবিনয়ের জীবন আজ খরস্রোত;—জীবনের এই স্রোতে অতীতের অনেক স্মৃতিই ডুবে গিয়েছে; সুচেতাও তার মধ্যে ডুবে গেছে। সুচেতাকে পাওয়া যে একদিন তার জীবনের ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হ'য়েছিল, আজ সে কথা তার মনেও পড়ে না। বিয়ের প্রথম অবস্থায় একটা তুলনা মনে জাগত সুচেতা ও প্রীতার মধ্যে। সে ব্যবসায়ী লোক;—হাতের একটা পাখী যে বনের দুটো পাখীর চেয়ে মূল্যবান, এটুকু বুঝতে তার দেরী হবে কেন! কাজেই যা হাতে পেয়েছে তাতেই সে সন্তুষ্ট হ'ল।

এমনি ভাবে তার জীবন যখন চলছিল, তখন এক বন্ধু গৃহে একটি লোককে হঠাৎ সে দেখতে পেল; কোথায় যেন তাকে সে দেখেছে মনে হ'ল। এই বেশ ও বসন নিয়ে তাদের ধনী-অভিজাত সমাজে এই লোকটী কে! উভয়ের দেখা ঠিক সামনা সামনি হয় নি; দেখা হয়েছে একজনের বহির্গমনের ও তার নিজের প্রবেশের মুখে। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানল এর নাম কুমার।

সে ভাবল, কুমার দুবার তার জীবন পথে এসেছে, একবার কলেজে;—সেখানে তাকে পরাজয় ক'রে কুমার জয়ী

হয়েছে—অথচ সেই জয়কে সে নিজের কাজে লাগায় নি। এই পরাজয়কে নিয়ে সুশান্তর গৃহে কুমারের বক্র উক্তি সে ভোলে নি। আর একবার দেখা হ'য়েছে সুচেতার প্রণয়প্রেপ্সু হিসাবে; সেখানেও কুমার তাকে পরাজয় করেছিল।—কিন্তু সেই জয়ও কুমার ভোগ করতে পারে নি বা চায় নি! আজ আবার কুমার তার জীবনের পথে আসছে।···আসুক। এবার সে কুমারের উপর জয়ী হবে, কুমারকে দেখাবে জীবনকে ভোগ করা যায় কি ক'রে; এবার সে জয়ী হবেই। কুমারকে সে দেখাবে—যে সর্বশেষে হাসতে পারে তার হাসিই সত্যিকার হাসি;—শেষের জয়ই সত্যিকার জয়।

একদিন সে সুযোগ তার জুটে গেল; প্রীতার জন্মতিথি উপলক্ষে সেদিন তার গৃহে একটু ঘরোয়া উৎসবের আয়োজন হ'য়েছে। তার ও প্রীতার বন্ধুবান্ধবীরা তার গৃহে চা পানের জন্য আসছে। সে গৃহ-দ্বারে দাঁড়িয়ে নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করছে। তেতলার বারান্দায় প্রীতা অভ্যর্থনায় ও নানা ব্যবস্থায় ব্যস্ত। তার বান্ধবীরা কেউ ব'সে আছে, কেউ রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে রাস্তার জনস্রোত দেখছে। তাদেরই মধ্যে একজন প্রীতাকে ডেকে বলল - "সুবিনয় বাবু রাস্তার একটা vagabondএর সঙ্গে কি আলাপ জুড়ে দিয়েছে, দেখো।"

কৌতূহলী বান্ধবীরা সবাই দেখল। প্রীতা যেন বান্ধবীদের কাছে নিজেকে একটু ছোট বোধ করল।

কলিকাতার পথের জনস্রোতের মধ্যেও সুবিনয়ের পক্ষে এবার কুমারকে চিনতে কষ্ট হ'ল না। ফস্ করে দু পা পিছন

থেকে সুবিনয় ডাকল "কে, কুমার বাবু না!" অপ্রত্যাশিতভাবে পিছন থেকে সম্বোধিত হ'য়ে কুমার ঘুড়ে দাঁড়িয়ে সুবিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুবিনয় বলল—"চিনতে পারলেন না, কুমার বাবু? আমি সুবিনয়।"

কুমার—"ওঃ, আপনি হঠাৎ!"

সুবিনয়—"আমি ত হঠাৎ নয়—এটা যে আমার নিজের বাড়ী। বরং আপনিই হঠাৎ……।" বলেই সে একটু হাসল।

কুমার বলল—"তা অবশ্য ঠিকই! আমার এখানে আগমন নিতান্তই হঠাৎ।……তারপর কেমন আছেন সবাই?……

সুবিনয়—"তা মন্দ কি। অবশ্য, আমরা সাংসারিক লোক, সেই সাংসারিক হিসাবেই বলছি।…চলুন না…ভিতরে আসুন।…আজ আমার বাড়ীতে একটু উৎসব আছে। আপনার পায়ের ধূলো পড়লে খুসী হব।"

কুমার—"দেখুন, আমরা ঠিক উৎসবের লোক নই। আমার এই বেশভূষা আপনাদের সমাজে সবই বেখাপ্পা হবে। হয়ত আপনার অনেক আত্মীয়া বান্ধবীর সমাগম হয়েছে; তাঁরা এই বর্বরকে তাঁদের মধ্যে দেখে horrified হবেন, আপনাকে হয়ত এর জন্য তিরস্কার ভোগ করতেও হবে। কাজ কি এত হাঙ্গামায়, সুবিনয় বাবু!"

সুবিনয় মনে করল—তার বৈভব ও ঐশ্বর্য দেখিয়ে কুমারের উপর জয়ী হওয়ার পক্ষে এই হ'ল মৌকা। তাই

সে বিশেষ ক'রে কুমারকে অনুরোধ করতে লাগল। কুমার সম্মত হ'য়ে বলল—"বেশ চলুন।······কিন্তু উৎপাত ও অশান্তি সৃষ্টির জন্য শেষে আমাকে দোষী করবেন না।" ব'লে একটু ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি সুবিনয়ের দিকে দিয়ে সে একটু হাসল।

সুবিনয় কুমারকে নিয়ে ভিতবে গেল। তাকে তেতলার এক কক্ষে বসিয়ে সে চায়ের বৈঠক স্থলে গেল! প্রীতার বান্ধবীরা তাকে দেখেই হেসে উঠল—"মিঃ চৌধুরী কি শেষে রাস্তা থেকে ভবঘুরে ধ'রে এনে চা'র মজলিস জমাচ্ছেন।"

সুবিনয় একটু হেসে বলল—"আপনারা ওকে চেনেন না, আমার এক পুরানো বন্ধু, বহু বছর পর তার সঙ্গে দেখা।···"

একটু বিরক্তির সাথে প্রীতা বলল—"তা এত বছরই যখন বন্ধু বিরহ সহ্য হ'য়েছে, না হয় আজকের দিনটাও বিরহ-ব্যথা সহ্য করতে।·· "

সুবিনয় বলল—"প্রীতা, বিশেষ কারণ না থাকলে কি তাকে আনতাম। আর সে ঠিক ভবঘুরেও নয়, অশিক্ষিতও নয়। স্বদেশী হাঙ্গামায় দীর্ঘ জেল বাস করেছে; এখনও কংগ্রেসের কাজ নিয়ে আছে।······সে বেশ উচ্চ শিক্ষিত।"

একটি মহিলা বলল—"তা এই রাজদ্রোহীকে এর ভিতর আনা কি ভাল হয়েছে?"

প্রীতার এক বান্ধবী বলল—"তাতে ত আর আমরা রাজদ্রোহী হ'য়ে যাব না; এর জন্য আমাদের চাকুরীও যাবে না।······না, নিয়ে আসুন তাঁকে। রোজই আমাদের একঘেয়ে কথা ও আলাপ, আজ তাঁর কাছে তবুও একটু নূতন কথা শোনা যাবে;—তাতে প্রীতার চা'র আসর জমবে ভাল।"

সুবিনয়—“তবে নিয়ে আস্‌ব তাকে ?”

আরও দু তিনটি মেয়ে বলল—“হঁ্যা, আনুন।”

সুবিনয়—“প্রীতা, তোমার উচিত ওঁকে সঙ্গে ক'রে এখানে আনা······চলো তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই ; তারপর তুমিই এনে তোমার বান্ধবীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে।”

প্রীতা—“বেশ, চলো।”

সেই কক্ষে গিয়ে সুবিনয় উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিল ; উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রীতা বলল—“কুমারদা, তুমি !”······ বলেই সে নত হ'য়ে কুমারের পায়ের ধূলা গ্রহণ করল। কুমার ত্রস্ত হ'য়ে একটু স'রে গিয়ে বলল—“প্রীতা, এটা তোমার বাড়ি !”

সুবিনয় স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। এদের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় কি করে হ'ল !

কুমার হেসে বলল—“তোমার বিয়ের একটা নিমন্ত্রণ চিঠিও পাঠালে না, প্রীতা। ·····

প্রীতা বলল—“বেশ বলছ ত। কোথায় পাব তোমাকে ? ·· তারপর, কুমারদা' ! ·· সবই যেন কেমন ঘুলিয়ে গিয়েছে।······” একটু ক্ষুণ্ণ মনে আত্মগ্লানির সুরে সে শেষের কথা কয়টা বলল।

আবার প্রীতা বলল—“যা করছ; তা ত এঁর কাছেই শুনেছি।···হঠাৎ কলকাতায় এসেছ কেন ?”

কুমার হেসে বলল—“এসেছি তোমাদের দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে, দেবে কিছু টাকা ?

প্রীতা একটু হেসে বলল—“এটুকুও কি প্রীতার উপর আজ

ভরসা রাখতে পারছ না? কিন্তু সে কথা পরে, এখন চলো, সবাই ব'সে আছে চা'য়ের ওখানে চলো।..."

কুমারকে নিয়ে উভয়ে চা'র আসরে গেল। প্রীতার বান্ধবীদের মধ্যে দুএকজন কুমারকে সামান্য রকম জানত। কেউ বা দুএকবার মাত্র দেখেছিল; কেউ কলেজের ছাত্র হিসাবে তাকে জানত,—কেউ বা বিপ্লবী সংস্রবে তার কথা শুনেছিল; সে বহুদিনের কথা—প্রায় সবাই ভুলে গেছে। প্রীতা তাদের কাছে কুমারকে নূতন ক'রে পরিচয় করিয়ে দিল।

চা'র মজলিস ভেঙ্গে যাওয়ার পর প্রীতা সুবিনয়কে বলল —"কুমারদাকে আজকার দিনে আমি কিছু দিতে চাই, কি বল?

সুবিনয় যন্ত্রচালিতের মত জবাব দিল—"বেশ ত! তোমার যা খুশী হয় তা ই দাও।" আজকার সমস্ত আড়ম্বর ও উৎসব যেন তার কাছে ম্লান হ'য়ে গেল। প্রীতা কণ্ঠ হ'তে হারগাছি খুলে কুমারের হাতে দিয়ে বলল—"আমার জন্মদিনে তোমাকে আমার কণ্ঠের হারগাছি দিলাম, কুমারদা'।...

কুমার অভিভূতভাবে হাত পেতে তা গ্রহণ করল; একটু পরে বলল—"প্রীতা, এই হার নিয়ে কি করব আমি?...তার চেয়ে, সুবিনয়বাবু, আপনি এটা কিনে নিন না কেন?... আমি ভিক্ষুক, আমার অর্থের প্রয়োজন। আর, প্রীতার কণ্ঠ ত' আপনি রিক্ত রাখবেন না; তাই আপনার কাছেই বরং এটা বেচে যাই ..."

সুবিনয় প্রীতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; যেন তার

কাছে ইঙ্গিতের অপেক্ষা করছে; প্রীতা বলল—"বেশ ত তাই করো।

স্ুবিনয় বলল—"বেশ, কত দাম দিতে হবে?"

কুমার বলল—"আপনার জিনিস আপনি জানেন, এর দাম কি?..."

সুবিনয় বলল—"বেশ ত এর যা সত্যিকার মূল্য তার চেয়ে এর মূল্য কত বেড়ে গেছে।.. এটা এখন ছুজনের সম্পত্তি; তাই কেনা মূল্যের চেয়ে ডাবল মূল্য এর হয়েছে। "

সুবিনয় একখানা ছ'হাজার টাকার চেক্ লিখে কুমারের হাতে দিল। সে ভাবতে চেষ্টা করল—বদান্যতার পোষাক পবে নিজের ঐশ্বর্য দিয়ে সে এবার কুমারের উপর জয়ী হবে;—কিন্তু বুদ্ধির এই যুক্তি মন মানতে চাইল না। মন যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে ক্রমাগতই বলছিল—পরাজয়, আজও তোমার পরাজয় হ'ল।

পাগলী

ভোর রাত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত ক'রে বীরুদের বাড়ী থেকে কান্নার রোল উঠল। সবাই বুঝল, বীরুর বাবা মারা গেল। বছর তিরিশেক তার বয়স—স্ত্রী ও দু'টি শিশুপুত্র রেখে সে চ'লে গেল। প্রতিবেশী মেয়েরা এল—বীরুর মা'র বুকফাটা কান্না শুনে অনেকেই অশ্রু বিসর্জন করল। দু'একজন খোঁচা দিতেও ছাড়্ল না—বউ যেদিন ঘরে এসেছিল, সেদিনই তারা নাকি জানতে পেরেছিল, এই বউ হবে "ভাতার-খাকী"। তার দেহে কত সব দুর্লক্ষণ আছে তারও একটা হিসাব হ'য়ে গেল।

বীরুর বয়স বছর পাঁচেক, নীরুর মাত্র বছর দুই হবে। নির্বোধ বালকদ্বয় সঠিক বোঝেও না কি সর্বনাশ তাদের হ'য়ে গেল। মা'র সেই করুণ ক্রন্দনে ভীত হ'য়ে তারা কাঁদতে শুরু করেছে। কিন্তু এত কান্নার পরও আজ আর কেউ এসে তাদের কোলেও নেয় না, আদরও করে না। তাদের স্নেহময় পিতা একপাশে শুয়ে আছে—তাদের এত কান্নায়ও সে উঠছে না। আর মা—একবার ফিরেও দেখছে না, কেবল কাঁদছে। অথচ এই বাবা মা-ই তাদের এতটুকু কান্না কোনদিনই সহ্য করে নি—ছুটে এসে কোলে তুলে আদরে ভরে দিয়েছে।

পাড়ার আর একটি বউ—মা'র প্রায় সমবয়সী—বীরু ও নীরুকে কোলে তুলে নিয়ে তার কাছে গিয়ে বলল, "সুরমা, এদের দিকে চেয়ে দেখ্—আজ থেকে যে তুই এদের মা ও বাপ। কেঁদে কেঁদে যে এ দু'টো শেষ হ'ল।"

তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল—বালক দু'টিকে মা'র কোলে দিয়ে তার পাশে সে বসল। মা বীরু ও নীরুকে কোলে তুলে নিয়ে অন্তরের অন্তহীন উদ্বেলিত কান্নার বেগ জোর ক'রে দমন করতে লাগল।

ঐ বউটি সুরমাকে জড়িয়ে ধ'রে বসেছিল। সে আস্তে আস্তে বলল, "তোকে সান্ত্বনা দেবার আমার কিছু নেই—কিন্তু এটা যেন ভুলিস না কি দায়িত্ব তিনি তোকে দিয়ে গেলেন। বীরু-নীরুর ভিতর তিনি আছেন। আজ থেকে তোর সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা, সমস্ত ধর্মকর্ম এদের সেবায়। . "

স্বামীর শব শ্মশানে নিয়ে গেল—প্রতিবেশিনীরা একে একে চলে গেল। সুরমা ও তার সখী উমা শুনল, একজন বলছে—"মা লো, মা, আজকালকার মেয়ে—এমন জলজ্যান্ত স্বামীটা মারা গেল, আধঘণ্টা-ও কাঁদল না।" আর একজন বলছে, "আর এই সোয়ামী জীবিত থাকতে তাকে নিয়ে কত ঢলানী-ই ছিল।" আর একজন বলছে, "ঐ আর একটা বউর কাণ্ড দেখলে? তুই এয়োস্ত মেয়ে, এই ভাতার-খাকী বউটাকে জড়িয়ে ব'সে আছিস কেন! কোনো ধর্মশাস্ত্র এরা মানবে না।"

একজন জবাব দিল—"ধর্মশাস্ত্র মানে না, তার ফলও হাতে হাতে পায়।"

তারা সব চ'লে গেল। সুরমা বলল, "উমা, তুই যা, ভাই। আমার পোড়া কপালের তাপ লাগাস না!"

উমা—"ছিঃ, কি যে বলিস, ওদের কথায় তুই বিচলিত হচ্ছিস!"

সুরমা—"না বোন, আমার ভয় হয়—কে জানে কিসে কি হয়। এই অবস্থা যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়।"

উমা সুরমাকে আরও জড়িয়ে ধ'রে বসল। সম্বরিত কান্নার বেগে উমার কোলে এলায়িত তার দেহ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

তারপর এল একটা নিষ্ঠুর রীতির পালা। উমা তার চোখের জল সম্বরণ করতে পারল না। সুরমার স্বামী-সোহাগের সব সাজ-সজ্জা খুলে নিরাভরণ ক'রে তাকে বৈধব্যের থান পরিয়ে দিতে হ'ল। সীথির সিন্দূর ঘ'ষে তুলতে হ'ল। উমার চোখের জল আর বাধা মানছে না—সে অঝোরে কাঁদছে, কিন্তু সুরমার চোখ শুষ্ক। কান্না যে তাকে দমন করতে হবে—তার চোখের জলে তার বীরু-নীরু আঘাত পাবে, তাদের অকল্যাণ হবে।

স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে নারী ম'রে গেল—কিন্তু মা বেঁচে রইল। সুরমা আজ কেবল মা—বীরুর মা, নীরুর মা। এই মাতৃত্বই আজ তার ধর্ম।

* * * *

বারো তেরো বছর পরের কথা। আবার একদিন পূর্বাহ্নে প্রতিবেশীরা হঠাৎ শুনল—বীরুর মা কাঁদছে। সেবার কান্না শুনেই সবাই বুঝেছিল কান্না কেন, কিন্তু আজ কেউ জানে না এ কান্না কেন। সকলের আগে এল উমা—অন্য প্রতিবেশিনীরা একে একে এসে হাজির হ'ল।

বীরু ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেয়ে কলিকাতা গিয়েছিল পড়তে। এক বছর হ'ল সে কলিকাতায় আছে। এমন সময় চট্টগ্রামে

হ'ল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন—কলকাতায় গ্রেফতার হ'ল বীরু। বীরু চট্টগ্রাম কখনও যায়নি—এমন কি চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও সে কখনও যায় নি। কিন্তু সে কৈফিয়ৎ কে শোনে! কার্য-কারণ সম্পর্ক অতি স্পষ্ট—রাজ্যে কিছু একটা যখন ঘটেছে, কাউকে তার জন্য শাস্তি পেতে হবেই। ঝড়ে সাধুর নাও যখন ডুবেছে, অন্ততঃ কুম্ভকারের দণ্ডবিধান ক'রে রাজবিধানেব মর্যাদা রাখতে হবে। বাংলার জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য বীরুকে কারাপ্রাচীরের বাইরে রাখা যায় না—সুরমার বুকের ধনকে কেড়ে নিতেই হবে। নতুবা বাংলার শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হবে।

প্রতিবেশিনীরা নানারকম মন্তব্য করতে লাগল। কেউ সহানুভূতি দেখাল, কেউ বীরুর সুখ্যাতি করল, কেউ পরিতৃপ্ত ঈর্ষাকে ভদ্রতাব ব্যর্থ আবরণ দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করল।

একজন বলল, "কি করবে মা, যেমন তোমার কপাল। অমন স্বামীই যেদিন হারালে সেদিনই তো জানলে, কপালে সুখ নেই।"

আর একজন সায় দিয়ে বলল, "তাই তো বলি, বীরুকে এত পড়াবার কি দরকার ছিল! কলিকাতা না গেলে তো এই ঘটনা ঘটত না।"

আর একজন গোপনে বলবার ভানে শুনিয়েই বলল, "কি গরব ছিল এই ছেলের জন্য—যেন এমন ছেলে আর হয় না।"

আর একজন বৃদ্ধা বললেন, "তা সত্যি বলতে কি, এমন ছেলে পাড়ায় ক'টি আছে? স্বভাব-চরিত্রে, কথায়-বার্তায়, কাজে-কর্মে, পড়াশুনায় এমন আর একটি ছেলে বের কর

তো। বীরুর মা, দুঃখ কোরো না তুমি—এই ছেলে নিয়ে তোমার গৌরব কবারই কথা। কিন্তু মা, বড় যে হয় দুঃখ তাকে পেতেই হয়। তাই বীরুর কপালেও দুঃখ আছে। মা, রামায়ণ, মহাভারত পড়েছ তো—জান তো শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ, এরা সবাই কত দুঃখ পেয়েছেন।"

একটু থেমে আবার তিনি বলতে লাগলেন, "কি আর বলব মা, তুমি তো বোঝ সবই। সে কোন অপকর্ম ক'রে জেলে যায় নি—গিয়েছে দেশের সেবা করার জন্য।...ঐ দেখ নীরুও এক পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে—পাড়ার সব ছেলেরা তোমার দুয়ারে আজ। ওরা সবাই বীরুদা'র ভক্ত। আমাদের খুকীটা পর্যন্ত বিছানায় প'ড়ে কাঁদছে। সেবার ওর অসুখের সময় কি খাটুনিটাই সে খেটেছে।"

পাড়ায় আট-দশটি ছেলে নীরুকে ঘিরে কি সব চুপি চুপি বলছে।

আস্তে আস্তে সবাই চ'লে গেল—উমা আবার সুরমাকে ধ'রে ঘরে নিয়ে গেল। সুরমার পাক হচ্ছিল, এমনি সময়ে চিঠি এল—বীরুর একটি বন্ধু খবর দিয়েছে। তরপরই ঐ কান্না-কাটি।

* * * *

বিকেল বেলা আশেপাশের গরীব দুঃখীরা অনেকে এল—কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। সবাই দুঃখ ক'রে গেল, বীরুর কত সুখ্যাতি করল—কবে সে এদের কাকে কি ভাবে সাহায্য করেছে, কবে দু'টো মিষ্টি কথায় এদের দুঃখময় জীবনের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে।

সন্ধ্যার পর উমার স্বামী নিকুঞ্জ এসে ঠিক ক'রে গেল—দু' একদিনের মধ্যেই সে সুরমা ও নীরুকে নিয়ে কলিকাতা যাবে—বীরুর সঙ্গে দেখা করতে।

কলিকাতা এসেছে কিন্তু দেখা করার অনুমতি পায় না। পাঁচ-সাত দিন চ'লে গেল, বীরু যে কোথায় আছে সে খবরও পাওয়া গেল না।

দশ-বারো দিন অপেক্ষা ক'রে দেখা করার অনুমতি পাওয়া গেল। জেল কর্মচারী ও পুলিশ কর্মচারীর সাক্ষাতে এক ঘণ্টার জন্য দেখা হ'ল। যে সব প্রশ্নে ও জবাবে ঐ সব কর্মচারীর অনুমোদন আছে, কেবল তারই আলোচনা সম্ভব হ'ল। বীরুও মাকে আঘাত দিতে চায় না—তাই সব কথা সে এমনভাবে বলল যাতে মা মনে কোন বেদনা না পান। বহু জনশ্রুতি ও লোকমুখের কথায় মা'র মনে যে সব আশঙ্কা জন্মেছিল, তার কোনই অপনোদন হ'ল না।

মা ফিরে এল ;—বীরুও জেলের ভিতরে ফিরে গেল। কেবল নীরু যেন কিছু একটা অনুমান ও আন্দাজ করল! মুখে তার একটা ক্রুদ্ধ ভাব।

বাড়ী ফিরে এল ;—দিন তাদের চলতে লাগল।

* * * *

মাতৃহৃদয়ের যত সেবা ও পূজা এতদিন দুই ভাই পাচ্ছিল ; এখন তা পেতে লাগল একা নীরু। নিয়মমতো হিসাবমতো বীরুর চিঠি আসে—মসীলিপ্ত, ঘর্ষিত, আঁচড়ানো—বহু লাইন তার পাঠোদ্ধার করা যায় না। এমনি মাপা-জোখা চিঠিতে মাতৃ-হৃদয় তুষ্ট ও তৃপ্ত হয় না।

মা জানেন, জেলের জীবন সর্বপ্রকারে পরবশ জীবন—সেখানে উভয় পক্ষের সন্দেহে সংঘর্ষ হ'য়ে ওঠে অনিবার্য। প্রবলের পক্ষ থেকে আসে উদ্ধত আচরণ এবং কর্তৃত্বের ও প্রভুত্বের দাবী ;—এদের পক্ষে তা হ'য়ে দাঁড়ায় অপমানের জ্বালা। তার ফলে এরা বরণ ক'রে নেয় আরও অত্যাচার, নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও অনশন।

তাই চিঠির ঐ মসীলিপ্ত অংশের পিছনে মাতৃ-হৃদয়ের সব আশঙ্কা জ'মে ওঠে। যে অংশ তিনি পড়তে পাবলেন বা বীরু যা লিখতে পারল, সেটা নিতান্ত মামুলী মঙ্গল সংবাদ জ্ঞাপন ও কামনা। কিন্তু যা তিনি পড়তে পারলেন না বা বীরু লিখতে পারল না, তাতেই যে সব কিছু জানবার ও লিখবার রয়ে গেল—মাতৃ-হৃদয় তা সহজেই ধ'রে নেয়।

শঙ্কিত ও বঞ্চিত হৃদয়ের সব কামনা পরিতৃপ্তি খুঁজতো নীরুকে আশ্রয় ক'রে।

* * * *

এমনি ক'রে চলল কিছু দিন। তারপর পুলিশ নীরুকেও নিয়ে গেল। একটা বিচারের প্রহসন ক'রে তার পাঁচ বছর দ্বীপান্তরের আদেশ হ'ল ;—মাতৃ-হৃদয় শূন্য ক'রে সে চলে গেল আন্দামানে। বীরু গিয়েছে আজ দু' বছর হ'ল। এখন নীরুও গেল। মা'র আজ গৃহ শূন্য, অন্তর শূন্য। তাঁর সমস্ত অন্তর আজ ভ'রে আছে কেবল তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে—যেমন রিক্ত মরুভূমির তপ্ত বায়ু।

তবুও দিন চলতে লাগল, অর্থাৎ মা দিনগুলিকে ঠেলে সরিয়ে দিতে লাগলেন। যে সেবা ও পূজা তিনি দিন দিন

তাঁর বালগোপালদের দিচ্ছিলেন, আজ তা তিনি কৃপণের মতো নিজের অন্তরে জমা করতে লাগলেন। কত স্বপ্ন তিনি দেখছেন, কত কল্পনা তিনি করছেন, কত কামনা তিনি জমিয়ে রাখছেন। কিন্তু আশঙ্কা জমছে আরও অনেক।

আজ খবর পাচ্ছেন হিজলীতে গুলী চলছে—আজ খবর এল দেউলীতে অনশন—আজ সংবাদ পেলেন বহরমপুরে মারামারি হয়েছে—আজ বক্সাতে না কি ঠেঙ্গাঠেঙ্গি হয়েছে—তাবপব খবর এল আন্দামানে অনশন চলছে—কয়জন মরেছে—কে কোথায় পাগল হয়েছে—কে কোথায় আত্মহত্যা করেছে—কে কোথায় দীর্ঘকাল যাবৎ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে।

এমনি ক'রে মা'র দিন কাটছে—তিনি দিনগুলি গুণে গুণে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন—আগামী দিনকে মনে মনে বরণ ক'রে নিচ্ছেন, কবে তাঁর অন্তরের বালদেবতারা ফিরে আসবে। আব কোন ধর্ম তিনি আচরণ কবেন না—আর কোন ধর্ম তিনি জানেন না।

উমা প্রায় রোজই আসে। তার সঙ্গেই তাঁর অন্তরের যোগ আছে। ও বাড়ীর খুকীও আসত। পুলিশ তাকেও ধরেছে। তাদের আত্মীয়স্বজন এর জন্য দায়ী করে বীরুকে—তারই সংসর্গে সে পুলিশের নজরে পড়েছে।

*　　*　　*　　*

একদিন দুপুরে মা'র বাড়ীর দরজায় একখানা গাড়ী এসে থামল—তিনি আশায় ও আশঙ্কায় বেরিয়ে এলেন। কয়েকজন পুলিশ প্রহরী-বেষ্টিত বীরু মা'র কোলে ফিরে

এসেছে। পাগলিনীর মতো তিনি ছুটে গেলেন—বীরুর চেহারা দেখে মা কেঁদে উঠলেন।—"এ কি হয়েছে তোর, বীরু?"

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব এল—"মা, আমি যে উঠতেও পারি না—"

মা—"তোর কোন অসুখের খবর তো কখনও লিখিস নি।"

বীরু চুপ ক'রে রইল। পরে বলল, "মা, এদের দায় আজ তোমার উপর ঠেলে দিতে এসেছে।"

মা'র মুখের চেহারা ও কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন বদ্‌লে গেল, চোখ মুখ দিয়ে একটা দীপ্তি বেরুতে লাগল। দীপ্তকণ্ঠে তিনি পুলিশকে বললেন, "এই ছেলে আমি নেব না, এর চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারের। আমি দরিদ্র বিধবা—এমন ধন বা জনসম্বল আমার নেই যে, আমি এর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে পারি।"

বীরু বলল, "মা, নিও না এই দায়িত্ব—ফিরিয়ে দাও।"

পুলিশ বলল, "আমরা কি করতে পারি, বলুন!—আমরা কলিকাতা থেকে একে নিয়ে আসবার হুকুম পেয়েছি—নিয়ে এসেছি।"

শেষ পর্যন্ত বীরু রয়েই গেল;—রুগ্ন, মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রকে দ্বার থেকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তি মা'র নেই। বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে মুখে যত কথাই আসুক, মা'র অন্তরের কথাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। একদিন স্বামী-সোহাগিনী নারীর উপর জয়ী হয়েছিল—মা; আর আজ

বিদেশী রাজশক্তির অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নারীর উপরও জয়ী হ'ল—সেই মা।

বীরু আবার মা'র কোলে—সেই ছোট্ট নিঃসহায় শিশুটির মতো মা'র কোলে। বীরু আজ শয্যাশায়ী। সে জানে দীর্ঘদিন তার আয়ু নেই। তবুও ঠিক যৌবনের প্রারম্ভে, কর্মপ্রেরণার সূচনায়, দেশসেবার নূতন কারা-দীক্ষার উন্মাদনায় কেউ মরতে চায় না। বীরুও মরতে চায় না। সুদীর্ঘ ছয় বছরের বন্দীজীবনে কত কর্মসঙ্গী ও বন্ধু জুটেছে, দেশসেবার কত বিস্তৃত ক্ষেত্র ও ভাবধারার সন্ধান সে পেয়েছে। কত কাজ সে করবে, কত সেবা সে দিবে, কত অর্ঘ্য দেশমাতৃকার জন্য সে জমিয়ে রেখেছে।

আজ বীরুর জীবন এখানে নিঃসঙ্গ—পাড়া-প্রতিবেশীরা সভয়ে এদের বর্জন ক'রে চলে। যুবকদের মধ্যে কেউ কেউ লুকিয়ে আসে এবং ধরা পড়লে অভিভাকদের কাছে গাল খায়। আজ কেউ তাদের দেখবার নেই, দু' পয়সা দিয়ে সাহায্য করবার নেই। সংক্রামক পীড়ার মতো সে আজ সবার পরিত্যাজ্য। তবুও বীরুর মা'র দিন কাটছে—তারপর……

* * * *

আবার একদিন কান্নার একটা করুণ রোল উঠল ;—বীরু তখনও শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে নি। মা'র হাতখানা ধ'রে সে বলছে, "মা, অনেক দুঃখ তুমি পেয়েছ, আমিও অনেক দুঃখ দিয়েছি।……মা, আমাদের দেশ, আমাদের জাতি পরাধীন—তার দণ্ড তুমিও পেলে, আমিও পেয়েছি।…

কিন্তু আমার জন্য দুঃখ কোরো না, কেঁদো না মা, নীরু ফিরে আসবে, তাকে আমার স্নেহ দিও .....সে হয়তো তোমাকে সুখী করবে।”

মা'র মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হ'ল না, চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও পড়ল না। কিছুক্ষণ পরে বীরুর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মা বললেন, “বীরু, আমার জন্য ভাবিস না। এখনও তোর সেরে উঠবার আশা আছে—তুই সেরে উঠবি, নীরুও ফিরে আসবে।”

বীরু একটু হেসে হাতের ইঙ্গিতে জানাল—তার আর ভাল হবার আশা নেই।

* * * *

যতক্ষণ বীরুর শব প্রাঙ্গনে ছিল, ততক্ষণ মা'র মুখেও একটু কান্না নেই, চোখেও এক ফোঁটা অশ্রু নেই। বীরুর শব নিয়ে গেল—উমার কোলে সংবিৎ-হারা মা'র দেহ এলিয়ে পড়ল। কয়েক ঘণ্টা পর সংবিৎ ফিরে পেয়েই মা ব'লে উঠলেন, “আমার কিছু নেই, সব কেড়ে নিয়েছে।”

* * * *

কে এক উন্মাদিনী নারী রাস্তায় রাস্তায় ফিরছে, কেউ তাকে চেনে না। সে কেবল বলছে, “আমার কেউ নেই, সব কেড়ে নিয়েছে।” আজ ট্রেন থেকে সে এখানে নেমে পড়েছে—কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছিল, কেউ জানে না।

বয়স্করা কেউ করুণা ক'রে বলে—আহা, কত আঘাত না জানি জীবনে পেয়েছে। বালকরা কেউ ঠাট্টা করে, ক্ষ্যাপায়—কেউ বা দুঃখ ক'রে সহানুভূতি দেখায়।

ফল, দুধ প্রভৃতি ছাড়া কিছু খায় না—চেহারায় আচরণে পাগলামীর পিছনেও একটা শীলতা ও ভব্যতার ছাপ আছে। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে কেবল থেকে থেকে বলে ওঠে—"আমার কেউ নেই, সব কেড়ে নিয়েছে।" উদাস তাঁর দৃষ্টি, করুণ তাঁর কণ্ঠ।

একটি মুক্ত রাজবন্দী শুনেছিল বীরুর মার কাহিনী। বীরুর সঙ্গে সে একত্র জেলে ছিল। সে জানত নীরু আন্দামান থেকে ফিরে আজ কোথায় অন্তরীণাবদ্ধ আছে। সে বুঝল কে এই উন্মাদিনী—নিজের মা'র কাছে নিয়ে তাকে আশ্রয় দিল।

গভীর রাত্রে সে ফুক্‌রে কেঁদে ওঠে—"আমার কেউ নেই, সব কেড়ে নিয়েছে।"

নীরব নিস্তব্ধ নিশীথ আকাশের গায়ে এই করুণ ক্রন্দন প্রতিহত হ'য়ে ফিরে এসে ঝ'রে পড়ল ধরণীর গায়ে। যাদের ঘুম টুটল তারা বলল—রাত্রেও পাগলীর ঘুম নেই চোখে। তার মর্মব্যথার ব্যর্থ এই অভিব্যক্তি বাতাসে ভেসে ভেসে কার বুকের দ্বারে গিয়ে ঘা দিচ্ছে কে জানে। হয়তো কোন বিশ্বের ভাণ্ডারে তা সঞ্চিত হচ্ছে—হয়তো দেশের জাগ্রত জনের দ্বারেও তার ঢেউ পৌঁছুচ্ছে—হয়তো কোন দূর পল্লীগ্রামে নির্জন নির্বান্ধব কুটিরে একটি তরুণ যুবকের অশান্ত হৃদয়কে আরও অশান্ত ক'রে তুলছে এই করুণ ক্রন্দন—আমার কিছু নেই······